এখন ডুয়ার্স

১৬-৩০ নভেম্বর ২০১৬। ১২ টাকা

তিস্তা-তোর্ষা বঙ্গের মেলা-উৎসব

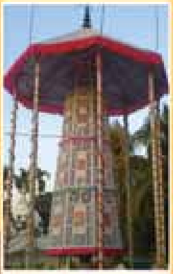

রাসমেলার রস ও রোমাঞ্চ

ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ক্লান্ত শিলিগুড়ির পুরনাগরিক

কোচবিহার উপনির্বাচন কি ওয়াকওভার?

পর্যটনের নতুন ঠিকানা টিলাবাড়ি

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

ধান-আঁকা সব ক্ষেতে আমরা ছিলাম মেতে
হেমন্তেরই বেলা
উত্তুরে ক্যানভাসে ভুটানপাহাড় ভাসে
মেঘগুলো সব ভেলা!
নতুন ধানের শিষে সুখ গিয়েছে মিশে
রোদ-শিশিরের খেলা
সবজি ভরা মাঠে আমার স্বজন হাঁটে
তোরাও কদম মেলা!
নরম শীতের হাওয়া ভাওয়াইয়া গান গাওয়া
'আইসেন বন্ধু অ্যালা...'
কোচ রাজাদের দেশে আনন্দরা এসে
সাজালো রাসমেলা!!

ছন্দে- অমিত কুমার দে
ছবিতে- সাত্যকি বিশ্বাস

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (অন্তর্বর্তী সংস্করণ) ১৬-৩০ নভেম্বর ২০১৬

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর নিয়ে 'মশকরা' আসলে পুতুল নাচের রীতি কথা ৩
তিস্তাবঙ্গের মেলা ও উৎসব ৪
রাসমেলার রস ও রোমাঞ্চ ১০
দূরবিন
শিলিগুড়ির মানুষ রাজনৈতিক নেতাদের কদর্য ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ক্লান্ত, ক্ষুব্ধ ১৫
ওয়াকওভার গেম তবু এত গুরুত্ব কেন? ১৭
উত্তরপক্ষ ১৯
হেমন্তের পড়ন্ত বেলায় ডুয়ার্স ২৮
তৃতীয় বিশ্বের নেতা ভারত আজ সঙ্গীহীন ২২
ডুয়ার্স চা-সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ নারী শ্রমিক ৩০
নিয়মিত বিভাগ
পর্যটনের ডুয়ার্স ২৪
খুচরো ডুয়ার্স ২৬
বইপত্রের ডুয়ার্স ৪০
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৪১
ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩৪
তরাই উৎরাই ৩৬
লাল চন্দন নীল ছবি ৪৫
শ্রীমতী ডুয়ার্স
এবারের শ্রীমতী ৪২
ভাবনা বাগান ৪৩

ডুয়ার্সের
কফি হাউস
এখন
জলপাইগুড়িতে

লাগাতার আড্ডা
গ্রুপ বৈঠক/সেমিনার
টিভিতে ম্যাচ দেখা
বাংলা-ইংরাজি পত্র-পত্রিকা
এবং গরম চায়ের মৌতাত

আর কী চাই?

বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা
রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও স্বাগত জানাই

আড্ডাঘর
মুক্তা ভবনের দোতলায়
মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

facebook.com/
aaddaghar

'এখন ডুয়ার্স' পুরনো সংখ্যা

'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার পুরনো সংখ্যার জন্য হামেশাই আমাদের কাছে ফোন বা মেল আসে। ম্যাগাজিন স্টলে বা হকারদের কাছে কোনও পত্রিকারই পুরনো সংখ্যা পাওয়া যায় না। আমাদের পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলি অবিক্রীত কিছু কপি সযত্নে রাখা থাকে। সারা বছরের প্রকাশিত সবকটি সংখ্যা এক সঙ্গে নামমাত্র দামে আসন্ন বইমেলায় 'এখন ডুয়ার্স' স্টল থেকে বিক্রি করা হবে।
বাইরেও কেউ চাইলে ক্যুরিয়ার যোগে পাঠান যেতে পারে।
যোগাযোগ দেবজ্যোতি কর, ৯৮৩০৪১০৮০৮।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর নিয়ে ‘মশকরা’ আসলে পুতুলনাচের রীতি কথা

কেউ বলেন, দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে এমনটা হয়েই থাকে। আবার কেউ কেউ একে আখ্যা দেন ‘কংগ্রেসি কালচার’ হিসেবে। তা হল বিভেদের মাঝে প্রতিপত্তি বজায় রাখা, দলে বিভেদ যত বাড়বে, ততই নিয়ন্ত্রণ বাড়বে। স্বাধীনতার আগে থেকে যে দলীয় রাজনীতি আমরা দেখে আসছি, আজ তার চেহারা আরও বেআবরু-খোলামেলা হলেও উদ্দেশ্য সেই একই থেকে গিয়েছে।

প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, যেটির সৃষ্টি ২০১১ সালে রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসবার পর। প্রাথমিকভাবে অবাক হলেও, উত্তরের পিছিয়ে থাকা মানুষ পরবর্তীকালে আপ্লুত হলেন। নতুন উন্নয়ন মন্ত্রীর ঝটিকা-গতিতে উত্তরবঙ্গের কোণে কোণে সফর, নতুন নতুন প্রকল্প ঘোষণা, অবিশ্বাস্য গতিতে রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, নতুন ‘উত্তরকন্যা’ ভবনের আবির্ভাব— মানুষ ঘোর-লাগা চোখে সব প্রত্যক্ষ করছিল। মুখ্যমন্ত্রী ঘন ঘন উত্তরে হাজির হওয়ায় নিন্দুকরা যেমন ঈর্ষান্বিত হচ্ছিল, ঠিক তেমনই নতুন ভরসার রোদ উঁকি দিচ্ছিল উত্তরের মানুষের মনে। আমরা সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর না হলে হয়ত এসব কিছুই হত না! গত পাঁচটা বছর ধরে এর আগের দীর্ঘ তিন দশকের বঞ্চনা যেন আরও প্রকট হয়ে আমাদের চোখের সামনে ধরা দিচ্ছিল।

নির্বাচনে দ্বিতীয়বার বিপুল জনাদেশ নিয়ে ফিরে আসায় উত্তরের প্রত্যাশা বেড়ে গিয়েছিল বলাই বাহুল্য। কিন্তু ততদিনে যে বড়সড় পাশা খেলা চালু হয়ে গিয়েছিল তা টের পাওয়া গেল নতুন মন্ত্রিসভার চেহারা দেখে, যদিও উন্নয়ন মন্ত্রী বদলে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। অবাক হওয়ার পালা তখনই শুরু হল, যখন দেখা গেল, হঠাৎ নতুন উন্নয়ন মন্ত্রীর মাথার উপর বসানো হল উপদেষ্টা কমিটি। যে কমিটি পরপর দুটো বৈঠক করেই তারপর চুপচাপ। তারপর শোনা গেল, একের পর এক বদলি হয়ে যাচ্ছেন দপ্তরের সব এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, অথচ খালি জায়গায় আসছেন না কেউ। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে দপ্তরের কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে, আর বিরক্ত মন্ত্রী তা নিয়ে সরাসরি নালিশ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

তৃণমূল সরকারে যদিও এটি প্রথম নজির নয়, তবু এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, সদ্য নিযুক্ত মন্ত্রীকে পদ দিয়েও কাজকর্ম করে দেখাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কেন? কী তাঁর অপরাধ? শুধু আলংকারিক পদ, লালবাতি ইত্যাদিতে উত্তরবঙ্গের মানুষের মন কি ভরবে? উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী না থাকলেও উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন সম্ভব কি না— এই বিতর্কে না গিয়েও অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি আগের ‘সক্রিয়’ মন্ত্রীকে বদল করে নতুন ‘নিষ্ক্রিয়’ মন্ত্রী বসাবার পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল?

এসব প্রশ্নবাণের উত্তরে কেউ যদি অভিযোগ করেন, এ হল কলকাতার সেইসব নেতার খেলা, যাঁদের হাতে কুক্ষিগত রয়েছে ক্ষমতার চাবিকাঠি, তবে তিনি কি কিছু ভুল বলছেন? উত্তরের নেতাদের পারস্পরিক সুসম্পর্কের অভাব সর্বজনবিদিত, কেউ কারও উপরে ওঠা মেনে নিতে পারেন না। একজনের দুর্দশা দেখে আজ যিনি তৃপ্তি বোধ করছেন, কাল যে তাঁর অবস্থান এর চাইতেও সঙিন হবে না তা তিনি নিজেও জানেন না। তেমনই কাল যিনি অন্যের উত্থান সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করেছেন, আজ তিনিই হয়ত বিপাকে। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার এহেন নির্লজ্জ আচরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহ দিয়ে চলেন কলকাতার সেইসব দাদারাই, বলাই বাহুল্য, নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই। উত্তরের তাবড় নেতাদের মাথার উপর বসানো হয় কলকাতার পর্যবেক্ষক নেতাদের, যেমন স্কুলের দুরন্ত ছাত্রদের চেঁচামেচি, হইহট্টগোল থামাতে বেত হাতে ক্লাসে ঢোকেন মাস্টারমশাই, আর শাসনের বিনিময়ে মেলে গুরুদক্ষিণা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর নিয়ে কলকাতার নেতৃত্ব এমন ‘মশকরা’ করার সুযোগ পান উত্তরের নেতাদের বিভেদের সদ্ব্যবহার করেই। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই সাপ-লুডোর খেলা আগামী দিনেও একইভাবে চলবে, কারণ এখানকার নেতৃবৃন্দ পুতুলনাচের চরিত্র হয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করেন।

‘এখন ডুয়ার্স’ নিয়মিত হাতে পেতে চান?

অবশেষে ‘এখন ডুয়ার্স’ পত্রিকার পাঠকদের জন্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আগামী ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এবং কলকাতা শহরের যে কোনও ঠিকানায় আমাদের প্রতিনিধি নিয়মিত ‘এখন ডুয়ার্স’ পৌঁছে দিতে পারবে। ২০১৭ সালের সব ক’টি সংখ্যার জন্য এককালীন ৩০০ টাকা জমা দিলেই এই পরিষেবা দেওয়া সম্ভব। আগামী ২৪ নভেম্বর, ২০১৬ শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিতব্য উত্তরবঙ্গ বইমেলাতে ‘এখন ডুয়ার্স’-এর স্টল থেকে এই গ্রাহক নেওয়া চালু হবে। যাঁরা নিজেদের ঠিকানায় নিয়মিত ‘এখন ডুয়ার্স’ পেতে ইচ্ছুক, যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি দপ্তরে। ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭ (বিকেল পাঁচটা থেকে রাত ন’টা পর্যন্ত)।

‘শ্রীমতী ডুয়ার্স’ ক্লাব

ডুয়ার্সের শ্রীমতীরা সব এক হোন। সংসার-প্রতিপালনের বাইরে নিজেদের ভাবনা-সুখ-দুঃখ-সৃজনীশক্তিকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে যোগ দিন ‘শ্রীমতী ডুয়ার্স’ ক্লাবে। আগামী ১৯ নভেম্বর ২০১৭ শনিবার ইন্দিরা গান্ধির ১০০তম জন্মদিনে জলপাইগুড়ির আড্ডাঘর-এ সূচনা হচ্ছে এই ক্লাব-এর। এর পর মাসিক বৈঠক বসবে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে। সদস্য হিসেবে নিজের নাম-ঠিকানা নথিভুক্ত করুন আজই। মুখ্য আহ্বায়ক শ্বেতা সরখেল- ৯৫৯৩৬৭৩৬১৬।

আঁকা: দেবরাজ কর

আতশকাচে ফুটে ওঠে অবহেলিত ইতিহাস

কখনও কোনও মজে যাওয়া নদীকে ঘিরে, কখনও কোনও জনপদে বা পাহাড়ে, বহুদিন ধরে চলে আসা গ্রামীণ মেলাগুলি আজও বয়ে চলে প্রাচীন লোককথা বা ইতিহাস। নানা সংস্কৃতির ধারা বারবার এসে মিশেছে ডুয়ার্সে, তার খোঁজখবর মেলে এইসব মেলাতেই। কয়েকটি পর্বে সেসবেরই হদিশ দিচ্ছেন **গৌতম গুহ রায়**।

শীত তখন যাই যাই করছে। ফাগুন মাসের ফুরফুরে বাতাস। এক বন্ধুর বিয়েতে নেমন্তন্ন। ময়নাগুড়ি থেকে চার-পাঁচ কিমি দূরে, আমগুড়ির পথের এক ছোট্ট গ্রামে যেতে হবে। এই গ্রামমুখী পথে গাড়ি চললেও মানুষের প্রধান যানবাহন ভ্যান রিকশা। পিছনেমমুখোমুখি ছ'জন বসা যায়। দরকারে মালবহন, সবজিবহনও করে থাকে, এমনই এক ভ্যান রিকশায় চড়ে বসলাম। ছ'জন আরোহীর তিনজন পথেই নেমে যাবেন। চলার পথে পথেই আরও বেশ কয়েকটি রিকশাসঙ্গী জুড়ে গেল। হঠাৎই রাস্তার ধারে যাত্রাবিরতি। ইতিপূর্বে সেখানে হাজির আরও বেশ কিছু এমনই ভ্যান, সাইকেল ও মানুষের ভিড়ে রাস্তার দু'পাশ জমজমাট। চালক জানালেন এই জায়গাটার নাম 'কন্যাবর', অনেকে বলে আসলে 'কইন্যাবর' বা 'কইনা বরের ঢ্যাম'। রাস্তার অনতিদূরেই ক্ষীণতোয়া নদী কলখাওয়া, তার ওপারে এক ছোট্ট চালাঘর, যাকে ঘিরে মেলা বসেছে, রীতিমতো জমজমাট, হইচই। পথচলতি ফুরফুরে বাতাস মেজাজটাই পালটে দিয়েছে। বিয়েবাড়ি মাথায় থাকল, নেমে পড়লাম তিন বন্ধুতে। চালাঘরের আরাধ্যা দেবদেবীর নাম চমকে দিল— কন্যাবর ঠাকুর!

মেলা বলতে উত্তরবাংলার গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানা জায়গায় যেসব ছোট ছোট মেলা বসে, তেমনি; কিছু জিলিপি, গজা-খাজার দোকান, কিছু মনিহারি দোকান আর কৃষিকাজ-ঘরের কাজে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান। সঙ্গী ভ্যানচালকও এই গ্রামেরই মানুষ। তার কাছেই জানা গেল পিছনের কাহিনিটা। জল্পেশ ছুঁয়ে যাওয়া ময়নাগুড়ির অন্যতম নদী জটদা (জরদা!) নদীর মতোই একসময় জলে টইটম্বুর ছিল এই কলখাওয়া নদীও। জলপথের চল তখন ছিল অনেক বেশি। এমনই একদিন নৌকো করে বউ নিয়ে বিয়ে ফেরত বাড়ি ফিরছিল সদ্যবিবাহিত বর, প্রবল ঝড়ে হঠাৎ মাঝনদীতে ওই নৌকো উলটে যায়।

ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর খাগড়াবাড়ির এই কন্যাবর ঠাকুরের মতো স্থানীয় লোকবিশ্বাসকে ঘিরে গড়ে ওঠা গ্রামীণ মেলা গোটা বাংলার মতো এই জেলারও গ্রামে গ্রামে, ঘাটে-বন্দরে ছড়িয়ে আছে, মিশে গিয়েছে মানুষের জীবনচর্চায় ওতপ্রোতভাবে।

নৌকোডুবিতে বর-কনেসহ সমস্ত নৌযাত্রীরই সলিলসমাধি হয়। ধীরে ধীরে এই কাহিনি মিথ হয়ে ওঠে।

এই ঘটনাটি কবেকার তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা না থাকলেও চালাঘরের মন্দির ঘিরে মানুষের ভক্তি বাড়তে থাকে। এই 'কন্যাবর' ক্রমশ ঠাকুর হয়ে ওঠে। বিশ্বাসী মানুষ নতুন জীবনসাথি নির্বাচনের সময়, নতুন জীবনের প্রবেশপথে এই কন্যাবর-এর আশীর্বাদ চায়। বিয়ের সময় বা বিয়ের পর এখানে সুখী সংসারের বাসনায় মানত করে। বেশ কয়েক বছর আগেও ওই মন্দির সংলগ্ন একটা মাটির ঢিপি ছিল। নৌকোর মতো গড়ন তার। এই মন্দিরের সেবাইত মহেন্দ্রনাথ রায় ওই ঢিপির প্রসঙ্গে জানান যে, আগে ওই মাটি কেউ কাটত না, কিন্তু এখন চাষজমির গ্রাসে ঢিপিটি নিশ্চিহ্ন। হারানো ঢিপি কিন্তু লোকবিশ্বাসের নৌকো চড়ে মানুষের বিশ্বাসের দরিয়ায়। এখানকার মানুষ বিশ্বাস করেন, এখানে পুজো দিলে বর-কনেকে আশীর্বাদ করেন 'কন্যাবর ঠাকুর'; এখানে মধ্যরাতে শোনা যায় বিয়ের বাজনা, নদীতে ভেসে ওঠে চালুনবাতি, এমনই আরও অনেক কিছু। এমনভাবে যা হয়ত ছিল নিতান্তই লৌকিক ঘটনা/দুর্ঘটনা, তা মানুষের মুখে মুখে, গল্পে গল্পে আজ অলৌকিক।

ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর খাগড়াবাড়ির এই কন্যাবর ঠাকুরের মতো স্থানীয় লোকবিশ্বাসকে ঘিরে গড়ে ওঠা গ্রামীণ মেলা গোটা বাংলার মতো এই জেলারও গ্রামে গ্রামে, ঘাটে-বন্দরে ছড়িয়ে আছে, মিশে গিয়েছে মানুষের জীবনচর্চায় ওতপ্রোতভাবে।

মেলা নিছক মিলনক্ষেত্র বা ব্যবসাবাণিজ্যকেন্দ্রিক গ্রামীণ জমায়েত নয়, এই উৎসবে অন্তঃশীল হয়ে আছে এক ধরনের সমন্বয়ী সংস্কৃতি, যা লোকাবৃত জীবনচর্যার শাশ্বত চেহারাও। মেলাগুলো বহন করছে ধর্মীয়তা ও লোকাচারের উর্ধ্বেও এক শাশ্বত জীবনভাষ্য। সমাজের অন্তঃকাঠামোতে এ এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে অন্য আর-একটি মেলার কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রান্ত উত্তরবাংলা বা তরাইয়ের চা-বাগান পত্তনে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক মানচিত্র নতুনভাবে রচিত হয়। এই চা-বাগানের সূত্রেই ছোটনাগপুরসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক হয়ে এসেছে সহস্র মানুষ। শোষণ-নিষ্পেষণের প্রবল জাঁতাকলের ঘূর্ণি এদের প্রায় আধা-বন্য অবস্থায় রেখে দিয়েছে। এইসব মানুষও তাদের মনের ভিতর আনন্দের খোঁজে থাকত, সুখের স্বপ্ন দেখত। কোনও বড় আকারের উৎসবে ওরা ভাগীদার হতে পারত না, তবে দু'-তিনটি বাগানকে নিয়ে ছোট বা মাঝারি চেহারার মেলার আয়োজন হলে এরা তাতে যুক্ত হত। গোটা বছরের অন্ধকারে এ ছিল ক্ষণিকের ফুলকি উদ্ভাস।

মাদারিহাট থানার খাগড়াবাড়ির 'গাঁওপূজা'কে নিয়ে এমনই এক সম্মিলন দেখা যায়। অনেকদিন আগে থেকেই ফি-বছর এই মেলা বসে, হেসেনাবাদ চা-বাগান সংলগ্ন এই মাঠে। এই মেলার নির্দিষ্ট তারিখ নেই। চা-বাগান ও সংলগ্ন গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের সুবিধামতো একদিন এই মেলার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় এক শিমুল গাছের নিচে গ্রামথানে গ্রামদেবতার পুজো মূল উপলক্ষ। সাধারণত বছরের প্রথম দিকে গ্রামদেবতার কাছে সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষ আবালবৃদ্ধবনিতা একসঙ্গে সুখ ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করে। ব্যক্তি থেকেও এই প্রার্থনায় গ্রামের সমষ্টিগত শান্তি ও সুখের আর্তি থাকে বেশি। এই সমষ্টিগত ভাবনার দ্যোতক হয়ে ওঠে মেলার দ্বিতীয় পর্বটি। পুজোর দিন প্রত্যেকেই সাধ্যমতো মুরগি, পাঁঠা, কবুতর অথবা চাউল-সবজি প্রভৃতি নিয়ে আসেন। পূজান্তে সকলে একসঙ্গে ওইসব সামগ্রী মিলিয়ে সমবেতভাবে খাওয়াদাওয়া করেন। এ যেন আদিম সমাজের একতাবদ্ধ থাকার পরম্পরা ধরে রাখা।

'বল্লালগুড়ি গ্রামেও স্থানীয় ওরাওঁ, নেপালি, মেচদের মধ্যে বৎসরে একদিন গাঁও-পূজা (গ্রামপূজা) হইয়া থাকে।' অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা' গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ আছে। জঙ্গল বা পূজায় শুয়োর, পায়রা, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি মানত দেওয়া হয়। এখানে আরও লক্ষণীয় বিষয় হল, পায়রা ছাড়া অন্যান্য পশুপাখি বলি দেওয়া হয়; কিন্তু পায়রাগুলি উড়িয়ে দেওয়া হয় পূজার শেষে। এই পূজার নির্দিষ্ট কোনও পূজারি নেই। নিজেদের মধ্যে থেকে গ্রামবাসীরা পূজারি নির্বাচন করে। পূজা শেষে সাধারণ ভোজন হয়, সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া। গ্রামকাঠামোকে একজোটে বেঁধে রাখার সেই প্রাচীন পরম্পরা এভাবেই ধারণ করে থাকে এক-একটি মেলা উৎসব।

মেলা অনেক আগে থেকেই সমাজের অঙ্গ হয়ে আছে। এর চিহ্ন এই সময়ও বহন করছে। স্যান্ডারের 'Settlement Report'-এ আমরা অতীতের জলপাইগুড়ি

মাদারিহাট থানার খাগড়াবাড়ির 'গাঁওপূজা'কে নিয়ে এমনই এক সম্মিলন দেখা যায়। অনেকদিন আগে থেকেই ফি-বছর এই মেলা বসে হেসেনাবাদ চা-বাগান সংলগ্ন এই মাঠে। এই মেলার নির্দিষ্ট তারিখ নেই। চা-বাগান ও সংলগ্ন গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের সুবিধামতো একদিন এই মেলার আয়োজন করা হয়।

ও সংলগ্ন অঞ্চলের বেশ কিছু উৎসবের উল্লেখ দেখি, যার অনেকগুলো এখনও টিকে আছে। নয়া-খাওয়া বা নবান্ন খাওয়া, ধানের ফুল দেওয়া, বিষুয়া উৎসব, জিতুয়া উৎসব প্রভৃতি এর অন্যতম।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন প্রথম মেলা নিয়ে নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৮০৭ সালের গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিল-এর কর্মসূচিতে এ ছিল নিতান্তই বিভিন্ন জিনিসপত্রের আমদানি,

‘বল্লালগুড়ি গ্রামেও স্থানীয় ওরাওঁ, নেপালি, মেচদের মধ্যে বৎসরে একদিন গাঁও-পূজা (গ্রামপূজা) হইয়া থাকে।’ অশোক মিত্র সম্পাদিত ‘পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা’ গ্রন্থে এ কথার উল্লেখ আছে। জঙ্গল বা পূজায় শুয়োর, পায়রা, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি মানত দেওয়া হয়।

রপ্তানি ও কেনাবেচার বাজার এবং মেলাকেন্দ্রিক তথ্য। এর পর ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে মেলা উৎসব বিষয়ে বেশ কিছু আলোকপাত করেন। তবে ১২৬২ বঙ্গাব্দে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজে প্রকাশিত পঞ্জিকার দ্বিতীয় ভাগে বাংলার তিনশো নয়টি মেলার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সি এ বেন্টলির ‘ফেয়ারস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস ইন বেঙ্গল’ প্রকাশিত হয়। এর পর ১৯৫৩-য় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে অশোক মিত্র প্রণীত ‘ফেয়ারস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল’ এবং তাঁরই সম্পাদিত ‘পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা’ প্রকাশিত হয়, যা এ নিয়ে একটি বিস্তারিত তথ্যসংবলিত সংকলন।

১৯৫১-র ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার-এ যেসব মেলার উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্যে জলপাইগুড়ি শহরে দিনবাজারের নদীঘাটে দুর্গা পূজার নিরঞ্জন রাজবাড়ির মনসা পূজার মেলা, সোনার হাটের দুর্গা নিরঞ্জন, গৌরীহাটের চড়ক পূজার মেলা ও পাহাড়পুর গোশালার গোপাষ্টমীর মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মেলাগুলোতে সে সময় গড়ে হাজার তিনেক করে মানুষ সমবেত হত। ময়নাগুড়ির দুটো মেলার উল্লেখ উক্ত তথ্যে পাওয়া যায়। জল্পেশের শিবরাত্রির মেলাতে লক্ষাধিক মানুষের সমাগমের উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও বিজয়াদশমীর পরদিন হয় বার্নিশের ভাণ্ডানী মেলা। আলিপুরদুয়ারের হাটখোলার দুর্গা পূজার মেলা, কালচিনির হ্যামিলটনগঞ্জের কালী পূজার মেলার উল্লেখ রয়েছে ১৯৫১-র জেলা গেজেটিয়ারে। এ ছাড়াও গোটা জেলার বেশ কিছু দুর্গা পূজার মেলার উল্লেখ রয়েছে; এর মধ্যে মাদারিহাট, হান্টুপাড়া, বীরপাড়া, লঙ্কাপাড়া, মুজনাই, চুয়াখোলা প্রভৃতি চা-বাগান অধ্যুষিত অঞ্চলের দুর্গা পূজার মেলা উল্লেখযোগ্য। কালী পূজার মেলার মধ্যে নামকরা শিশুবাড়ি, ধামচিপাড়া, রামঝোড়ার মেলাং। ঝাড়বেলতলা, বেলতলি ভাণ্ডানী, ছোট শালকুমার ও হেদায়েত নগরের দোলযাত্রার মেলা সে সময় আশপাশের মানুষের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

মেলা বা উৎসবের মধ্যে এই অঞ্চলের মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সংস্কার, মূল্যবোধ, ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের স্থানীয় ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়, এর পাশাপাশি সমসময়ের ও বিগত সময়ের আর্থ-সামাজিক চালচিত্রও মেলাগুলোর সঠিক বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব। উত্তরবাংলার জনসমাজের নির্মাণে ও গঠনে যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তারও প্রতিফলন তাই এর মেলা ও উৎসবের মধ্যে লক্ষ করা যায়। বহু মানুষের সম্মিলন এই মেলার আলোচনা প্রসঙ্গে সুবীর চক্রবর্তী একে একে বিকল্প সংস্কৃতির ধারক বলে উল্লেখ করেছেন। ‘বাংলার নানা বর্গের মেলা ও বার্ষিক উৎসবের গতিপ্রকৃতি দেখে আরেকটা কথা মনে হয়। সারা বছরের সমাজ ও পরিবারপন্থী মানুষ তাঁদের যাপনে ও আচার-আচরণে একটা অনতিলক্ষ কিন্তু সুনিশ্চিত দেশজ সংস্কৃতির চর্চা পরিপোষণ করে চলেন। একদিকে যেমন জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সংক্রান্ত রীতিকৃত্য, পালপার্বণ, উপবাস-ব্রত-মানসিক, দানধ্যান, দেবস্থলে গমন, হরির লুট বা সত্যনারায়ণের শিন্নি— তেমনই চলে গোপালন, তুলসী বৃক্ষে জলদান, চন্দনচর্চা, ফুল ফোটানো, আকাশপ্রদীপ জ্বালানো, শেটেরা পালন আর দরিদ্রনারায়ণ সেবা। ওভাবেই এ দেশের সংস্কৃতি বহুদিন ধরে চলছে। নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতাও কিন্তু এমনতর জাতীয় ও ভূমিজ আচরণকে পুরোপুরি পালটাতে পারে না। ব্যস্ত শহুরে মানুষ তার দৈনন্দিনতার মধ্যে মার্বেল পাথর বা পালিশ করা কাঠের সিংহাসনের সামনে কিছুটা অভ্যাসবশত, কিছুটা হুজুগে ধূপ প্রদীপ প্রসাদি সহযোগে যে আরাধনায় যুক্ত থাকেন, সেখানেও কোথাও আদি মিলনের সুর বাজলেও এ এক নিছকই অর্চনার প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা হয়ে উঠেছে।’ এই নিত্যদিনের জীবনের সঙ্গে জড়িত সংস্কৃতির যে ধারা ও ধরন, তার পাশাপাশি আর-এক বিকল্প সংস্কৃতির ধরন দেখা যায় মেলা মহোৎসবে। তাতে গৃহকোণের বদ্ধতা কিংবা পরিবারকেন্দ্রিক স্বার্থ থাকে না। তার সঙ্গে সকলের সংযোগ থাকে। ছোঁয়াছুঁয়ি বা ছুঁতমার্গ থাকে না, থাকে না জাতি-বর্ণের আঁটাআঁটি।

তিস্তাবঙ্গের নানা প্রান্তেই অতি প্রাচীনকাল থেকেই সূর্য পূজা, মনসা পূজা, মদন বা কামদেব আরাধনা, হোলকা বা দোল উৎসবের মতো নানা চরিতের উৎসব হয়ে আসছে। একে কেন্দ্র করে জমে উঠছে মেলা। মেলা মানেই আমাদের মানসচক্ষে যে ছবিটি ভেসে ওঠে, সেটি সবসময় তার গভীরতার দ্যোতক নয়, মেলা বলতেই অনেকে মনে করেন এটি একটি সম্মিলিত বিনোদনের উৎসব। শুধুই বিকিকিনির হাট, তেলেভাজা ও জিলিপি। নাগরদোলা, কথা-বলা পুতুল, সবজিরাক্ষস বা জাদু আয়না ও সার্কাস। কিন্তু গ্রামবাংলার অধিকাংশ উপেক্ষিত অন্ত্যজের ‘অন্তঃশীল ইতিহাসের অদম্য ক্ষরণ’।

তিস্তাবঙ্গের প্রাচীন উৎসবগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় নদী বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। গোটা দেশের নদীমাতৃক সভ্যতার হাত ধরেই প্রাচীনকাল থেকে নদীকে ঘিরে, নদীকে জড়িয়ে যে উৎসব পরম্পরা, তার সঙ্গেও তাই মিলে

আছে এই অঞ্চলের উৎসব অভ্যাসও। কোনও উৎসবের প্রধান উপজীব্য খুঁজতে গিয়ে কোথাও দেখা যাবে বিভিন্ন নদীর নতুন রূপ, ভিন্ন চেহারা, আবার কোথাও বা কোনও উৎসবের প্রাণস্পন্দনে নদীর বিরামহীন প্রবাহের কলতান। গাঙ্গেয় বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত গঙ্গা পূজার উল্লেখ করতে হয় এ প্রসঙ্গে। কিন্তু উত্তরবাংলার তিস্তা, করতোয়া, তোর্সার উপত্যকা গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে অনেক দূরবর্তী হলেও গঙ্গা পূজার প্রচলন ও সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, বাংলায় নদী মাত্র 'গাং', শব্দটি 'গঙ্গা' শব্দ থেকে জাত। কাজেই গঙ্গার মতোই সব স্রোতস্বিনী নদীই মানুষের কাছে একই পুণ্যতোয়া রূপে আবির্ভূত হয়। বিশেষ কোনও সময়ে গঙ্গার মতোই ব্রহ্মপুত্র বা করতোয়ায় স্নান করে নিজেদের পাপমুক্ত করার জন্য হাজার নর-নারী জাতি-বর্ণ-বয়স নির্বিশেষে নদীর পাড়ে ছুটে আসে।

নদীকেন্দ্রিক উৎসবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত বারুণী স্নানের মেলা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে নদীতে স্নান করে এই উপাসনা উপলক্ষে যে উৎসব হয়, তা ছাড়াও

তিস্তাবঙ্গের প্রাচীন উৎসবগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় নদী বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। গোটা দেশের নদীমাতৃক সভ্যতার হাত ধরেই প্রাচীনকাল থেকে নদীকে ঘিরে, নদীকে জড়িয়ে যে উৎসব পরম্পরা, তার সঙ্গেও তাই মিলে আছে এই অঞ্চলের উৎসব অভ্যাসও।

নদীকে উপাস্য করে এখানে আরও বেশ কিছু পূজা-আরাধনা করা হয়। 'তিস্তাবুড়ি'র মতো বেশ কিছু নদীমাতৃক পূজা ও উৎসব রয়েছে।

চৈত্র মাসের ত্রয়োদশী তিথির নাম বারুণী। 'বারুণী' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'বরুণ' অর্থাৎ জলের দেবতা থেকে আগত। প্রতি বছরই চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষে এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমের বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছে বেরুবাড়িতে বহু প্রাচীনকাল থেকে একটি মেলা বসে। স্থানীয় ছোট নদী যমুনা এখানে উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে চলেছে, সদর ব্লকের দক্ষিণ প্রান্তের ঢোলক গ্রামের এই মেলার উল্লেখ প্রাচীন সরকারি নথিতেও রয়েছে। সেই তথ্য অনুযায়ী এই মেলার বয়স প্রায় দেড়শত বছর। অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা'তে এই মেলার বর্ণনায় বলা হয় যে, 'মেলাটি তিন দিন প্রত্যহ সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত চলে। প্রধানত ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ নং ইউনিয়ন এবং জলপাইগুড়ি হইতে মেলায় প্রতিদিন প্রায় আড়াই হইতে তিন হাজার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় নর-নারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণত ট্রেন, গোরুর গাড়ি এবং হাঁটিয়া আসেন।' বেরুবাড়ির এই মেলা এখনও বসছে, তবে চরিত্র পালটেছে অনেক। উল্লিখিত বিবরণীতে পাই, 'মেলার আমোদ-প্রমোদের মধ্যে হরিনাম-সংকীর্তন, সার্কাস, ম্যাজিক, থিয়েটার, জুয়া এবং অন্যান্য গানবাজনার ব্যবস্থা থাকে। হরিনাম সংকীর্তন এবং পালাটিয়া গানের আসরেও বহু লোকের সমাগম হয়।' আর আজকের মেলা তার পুরনো বৈভব অনেক হারালেও জনসমাগম আগের মতোই হয়। বিনোদন উপকরণ পালটে গিয়েছে আমূল, হরিনাম সংকীর্তন, সার্কাসের জায়গায় এখন নানা রকমের জুয়ার টেবিল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, ভিডিয়ো হল-সহ নাগরিক চাহিদার ছোঁয়ায় বিপণনের সামগ্রীও পালটে গিয়েছে। ভিড় বেড়েছে, কিন্তু বৈচিত্র কমেছে।

নদীকে আরাধনার এই পদ্ধতি অনেক পরে এই অঞ্চলে শুরু হয় বলে মনে হয়। লোকজীবনে নদীকে ধন-জন-সৌভাগ্যের প্রাপ্তির কামনায় আরাধনা করা হয়। নদীমাতৃক এই দেশে অনাদিকাল থেকে নদী বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে এই লোকজীবনে। এটাই স্বাভাবিক। অনন্তকাল ধরে অফুরান জলরাশি নিয়ে কোথা থেকে কোন অজানিত উদ্দেশ্যে সে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, লোকসমাজের কাছে তা এক উত্তরবিহীন বিরাট জিজ্ঞাসা। তাই বিস্ময়, ভীতি, শ্রদ্ধায় সে নদীকে দেখেছে দেবতার দৃষ্টিতে। তবে-মন্ত্রোচ্চারণ করে পবিত্র জলে স্নান করা হিন্দু উপাসনার এক অতি প্রাচীন এবং ব্যাপক প্রচলিত

চৈত্র মাসের ত্রয়োদশী তিথির নাম বারুণী। 'বারুণী' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'বরুণ' অর্থাৎ জলের দেবতা থেকে আগত। প্রতি বছরই চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষে এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমের বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছে বেরুবাড়িতে বহু প্রাচীনকাল থেকে একটি মেলা বসে।

উপাসনাপদ্ধতি। ঋগ্বেদের (৪-৬-২৮) থেকে জানতে পারা যায় যে এই পদ্ধতি সে সময়ও ছিল। ঋগ্বেদে নদীর সংগমস্থানকে পবিত্র বলা হত। উত্তরবঙ্গের মানুষের মধ্যে নদীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন একই রকম। এখানে মানুষের বিশ্বাস রয়েছে যে, 'করতোয়া নদী বছরের বিশেষ দু'টি সময়ে পবিত্রতা লাভ করে। অর্থাৎ অম্বুবাচির সময়। বলা হয়ে থাকে যে, বছরের এই সময়ে সব নদীই মাতা বসুমতীর রজঃ বহন করে। একমাত্র করতোয়ার জলই তখন পবিত্র থাকে। সুতরাং সেই সময় করতোয়ায় স্নান করলে শরীর ও মন পবিত্র হয়।' ঋগ্বেদেই আছে, কোশলের রাজা তাঁর প্রধান পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে বৈদিক হিন্দুধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। প্রাগ্জ্যোতিষপুরের পশ্চিম সীমান্ত তখন ছিল 'সদানীর' নদী। কোশলরাজকে এখানে থামতে হয়, যুদ্ধে হেরে ফিরে যান সদানীরের তীর থেকেই। এর পর শতপথ ব্রাহ্মণে স্কন্দপুরাণে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'পুরাণের সময়ই এই নদী হয়ে ওঠে 'করতোয়া'। তাই এখানে দেখি করতোয়া মাহাত্ম্য। ভারতের বনপর্বে এই করতোয়া হয়েছে পুণ্যতোয়া।' (চারুচন্দ্র সান্যাল)

নীহাররঞ্জন রায় করতোয়ার উল্লেখ করে লিখেছেন— মহাভারতের বনপর্বের

তীর্থযাত্রা অধ্যায়েও করতোয়া পুণ্যতোয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং গঙ্গাসাগর সংগমে তীর্থের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী প্রাচীন পুন্দনগল এই করতোয়ার উপরই অবস্থিত ছিল। নদী এই ভূখণ্ডের মানুষের জীবনচর্যার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে, মিশে আছে ধর্মাচরণে, বাণিজ্যে, মেলা ও উৎসবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পুরাণ মতে বরুণ-কন্যা ও সুরার অধিকারী দেবী 'বারুণী' সমুদ্রমন্থনকালে পূর্ব দিকের অপ্সরাদের ক্ষীরোদসমুদ্র থেকে চন্দ্যস্বধা, সুধা, ধন্বন্তরি, অপ্সরা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ এবং লক্ষ্মীর সঙ্গে বরুণ-কন্যা 'বারুণী'ও উত্থিতা হন। কিন্তু দিতির পুত্ররা বারুণীকে গ্রহণ না করায় তারা অসুর নামে অভিহিত হয়, অদিতির পুত্ররা বারুণীকে গ্রহণ করে সুর নামে অভিহিত হন। 'বারুণী' স্নানের সঙ্গে এই ভাবনার সম্পর্ক থাকতেও পারে। শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের কৃষ্ণত্রয়োদশী ও তৎকালীন পর্ব 'বারুণী'। বলা হয় যে, এই সময় গঙ্গাস্নানে শত সূর্য গ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়, শনিবার সংযুক্ত হলে এই তিথি 'মহাবারুণী' বলে অভিহিত হয়।

নদীকেন্দ্রিক 'বারুণী'র স্নান ও সেই উপলক্ষে এই জেলার বিভিন্ন জায়গায় মহা ধুমধামে মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্ষেত্রে জেলার ছোটবড় যে কোনও নদীকেই 'পুণ্যতোয়া' জ্ঞানে পবিত্র হয়ে উঠতে চান শ্রদ্ধালু মানুষরা। এমনই একটি উল্লেখযোগ্য মেলা বসে জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে মোহিতনগরে। করলা নদীতে এখানে হাজির হন জলপাইগুড়ি শহরসহ আশপাশের গ্রামাঞ্চল, এমনকি রাজগঞ্জের মানুষও। গৌরীহাটের মেলা নামে অভিহিত এই মেলা সাত দিন ধরে চলে। করলা নদী এখানে উত্তরমুখী। জলপাইগুড়ির রাজবধূ অশ্রুমতীর উদ্যোগে এখানে একটি মন্দিরও তৈরি হয়েছিল। গঙ্গাদেবী ও কালীমূর্তির আরাধনা হয়। মেলা শহর-ঘনিষ্ঠ হলেও গ্রামীণ চরিত্র ধরে রেখেছে। দই, চিঁড়ে ও পাঁপড় ভাজার আকর্ষণ ছাড়াও আছেন গৃহকাজের সরঞ্জামের ব্যাপারীরা।

আলিপুরদুয়ার মহকুমার সলসলাবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় গদাধর নদীর অষ্টমীর স্নান মেলা। একদিনের মেলা। গ্রামীণ হস্তশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রীর বিপণন এই মেলার বিশেষত্ব। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের আরও কয়েকটি মেলা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এর মধ্যে সাত পাকড়ির বারুণী স্নানের মেলা অন্যতম। দক্ষিণ বেরুবাড়ির সাতকুড়ায় কুডুম নদীর বাঁকে এই মেলা বসে। এখানে পূর্বে যমুনা ও পাগা নদী মিশেছে। তিনটি নদী যমুনায় মেলবার আগে কুডুম আঁকেবাঁকে সাত পাক খায়। এই সাত পাক ঘিরেই মেলা। পাঁচ-ছ'দিন ধরে চলে এই মেলা। খ্যাপার গান, পালাটিয়া গানের বিশেষ আকর্ষণ। গড়ালবাড়ির ছোবারহাটে মধুবাবুর মেলাও উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মী পূজার সময় দু'দিন ধরে এই মেলা হয়। এখানে মুর্শিয়াগান ও পালাগান দুয়েরই অনুষ্ঠান বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

শহরের দক্ষিণ-পূর্বের গড়ালবাড়ির যমুনা নদীর পারেও বারুণীর স্নান উপলক্ষে প্রাচীনকাল থেকে মেলা বসছে। ধূপগুড়িতেও ডাউকিমারিতে (হসপিটালপাড়া) বারুণী মেলা হয়। খোন থেকে বেশ কিছু দূরে গিলান্ডি নদীতে স্নান করে পুণ্যার্থীরা ডাউকিমারি মেলার উৎসবে শামিল হন। গিলান্ডির পাশে অস্থায়ী মন্দিরও তৈরি হয়। মেলাকে ঘিরে পালাটিয়া গানসহ অন্যান্য লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। নদীতে স্নান করে পবিত্রতার লক্ষ্যে বা মানবসভ্যতায় নদীর বিশাল ভূমিকার অনুযায়ী হয়ে যুগযুগান্ত থেকে নদীকে আরাধনার যে পরম্পরা আছে, তারই সূত্রধারা এইসব নদীকেন্দ্রিক মেলা ও উৎসব।

নদীকে অবলম্বন করে যেমন, তেমনি জল্পেশ, কামাখ্যাধাম প্রভৃতির মতো মন্দিরের ইষ্টদেবতাকে কেন্দ্র করেও মেলা বসে। ধর্মীয় মেলার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ বৈচিত্রপূর্ণ মেলাও এই জেলায় রয়েছে প্রচুর। এই বৈচিত্রকে রসদ জুগিয়েছে এর ভৌগোলিক অবস্থানও। উত্তরে হিমালয় এবং তার ওপারে নেপাল, ভুটান, তিব্বত থাকায় পাহাড়ের এপার ও ওপারের জনপদের বাণিজ্য-সম্পর্ক রক্ষার্থেও এই সীমান্তবর্তী জনপদগুলি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল একসময়। জলপাইগুড়ি জেলাতেও তিব্বত-ভুটান থেকে ব্যাপারীরা বাণিজ্য করতে আসতেন পশম, কস্তুরী, চামড়া প্রভৃতি পসরা নিয়ে। এখানে উল্লেখ্য

নদীকেন্দ্রিক 'বারুণী'র স্নান ও সেই উপলক্ষে এই জেলার বিভিন্ন জায়গায় মহা ধুমধামে মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্ষেত্রে জেলার ছোটবড় যে কোনও নদীকেই 'পুণ্যতোয়া' জ্ঞানে পবিত্র হয়ে উঠতে চান শ্রদ্ধালু মানুষরা। এমনই একটি উল্লেখযোগ্য মেলা বসে জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে মোহিতনগরে।

যে, ভুটানের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ও সম্পর্ক অনেক প্রাচীন। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের ('বাঙালির ইতিহাস'-এ) অনুমান উল্লেখযোগ্য— 'তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগের আর-একটি পার্বত্য পথ বোধহয় ছিল। এই পথ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং অঞ্চল হইতে সিকিম, ভোটান পার হইয়া হিমালয় গিরিপথের ভিতর দিয়া তিব্বতের ভিতর দিয়া চিনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পেরিপ্লাস গ্রন্থে (১ম শতক) বোধহয় এই পথের একটু ইঙ্গিত আছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে চিনদেশ হইতে যে রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি বঙ্গদেশে আসিত, তাহা পূর্বোক্ত কামরূপের পথে এই সদ্যোক্ত পথ বাহিয়া আসিত বলিয়াই তো মনে হয়। এখনও কালিম্পং বা গ্যাংটকের বাজারে যেসব পার্বত্য টাট্টু ঘোড়া, কম্বল, কাঁচা হলুদ, কাঁচা সোনার অলংকার, নানা বর্ণের পাথর ইত্যাদি বিক্রয় হয়, তাহা আসলে প্রায় সমস্তই আসে তিব্বত ও ভোটান হইতে, ওই দেশীয় লোকেরাই তাহা লইয়া আসে।'

তবে উত্তরের পার্বত্য ভূমির দেশ ভুটানের সঙ্গে এই অঞ্চলের সম্পর্ক যে সবসময় মধুর ছিল তা নয়। সংঘাত-সংঘর্ষ, দখলকারীর মধ্যে দিয়ে ভুটান এই অঞ্চলে নেমে আসতে চেয়েছে বারংবার। এই দখলদারিতে এই সীমাও তাই বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে। ১৭৭৪-এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ভুটানের মধ্যে যুদ্ধাবসানে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়; এরই ফলস্বরূপ ভুটানের সমতলে নেমে এসে অধিকার কায়েম সিদ্ধ হয়। তবে প্রায় একশো বছর জুড়ে নানা টালমাটাল অবস্থা, নানা লড়াই সমীকরণ পার হয়ে ১৮৬৪-তে ভুটানকে বিধ্বস্ত করে ইংরেজ শক্তি এই অঞ্চলে তাদের একাধিপত্য কায়েম করে। ১৮৬৪-র ৯ নভেম্বর স্বাক্ষরিত হয় 'সিনচুলা চুক্তি'। ভুটানের মধ্যে দিয়ে তিব্বতে বাণিজ্য করার জন্য তারা পথ খুঁজে পায়, যা ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। তবে এই দীর্ঘ টানাপোড়েন ডুয়ার্স এলাকার জনজীবনেও প্রভাব ফেলে। পাহাড় থেকে নেমে আসা ব্যাপারীরা তাঁদের পসরা নিয়ে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠেয় এই অঞ্চলের মেলাগুলোয় অংশ নিতেন। এই ভুটানি বা পাহাড়ি ব্যবসায়ীদের নিয়ে আসা সামগ্রী এইসব মেলা বা উৎসবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। মেলা শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে সমবেত উৎসবমুখর মানুষের সম্মিলন নয়। একে ঘিরে গড়ে ওঠে এলাকার ব্যবসা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাই এ এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মিলন। তাই আমরা দেখি, ময়নাগুড়ি, জল্পেশ বা কামাখ্যাগুড়ির কামাখ্যাধামের মেলার মতো প্রাচীন

উত্তরের পার্বত্য ভূমির দেশ ভুটানের সঙ্গে এই অঞ্চলের সম্পর্ক যে সবসময় মধুর ছিল তা নয়। সংঘাত-সংঘর্ষ, দখলকারীর মধ্যে দিয়ে ভুটান এই অঞ্চলে নেমে আসতে চেয়েছে বারংবার। এই দখলদারিতে এই সীমাও তাই বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয়েছে।

মেলাগুলোতে জড়িয়ে আছে বহিরাগত ব্যবসায়ীর বাণিজ্য কাহিনি। মেলাগুলোকে কেন্দ্র করে জেলার মানুষের উৎসবকেন্দ্রিক সম্মিলনের পাশাপাশি বাণিজ্যিক (বিপণন) সম্পর্কও সমৃদ্ধ হত। এখানে উল্লেখ্য যে, নিম্নবর্গের বণিকরা বাণিজ্যে সমুদ্রযাত্রার প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু পর্বত সংলগ্ন ডুয়ার্স ও সমতলের ব্যাপারীদের সঙ্গে ভুটান, নেপালসহ হিমালয়ের দেশগুলোরও বাণিজ্য-সম্পর্ক নিবিড় ছিল। তা-ই বলে বাণিজ্য জলপথ ব্যবহারে এই অঞ্চলের মানুষ অতীতে পিছিয়ে ছিল তা নয়। তিস্তা-করতোয়া ঘোরাঘাট আমাদের সেই অতীতের গৌরব বহন করছে।

নদীমাতৃক নিম্নবঙ্গের ব্যাপারীদের সমুদ্রপথে বাণিজ্যের ইতিহাস আমরা জানি, কিন্তু পাহাড়ি পথে তাদের বাণিজ্য বিবরণ তেমন নেই। এ ক্ষেত্রে তারা এই উত্তরবাংলার মতো পর্বতের সানুদেশ বা তরাই অঞ্চলকে বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করত, এখান থেকেই পরিচালিত হত পার্বত্য বাণিজ্য। এ ক্ষেত্রেও জনসংযোগ বা বাণিজ্য সংযোগের সূত্র হয়ে উঠত মেলাগুলো। বছরের পূর্বনির্ধারিত সময়ে এই মেলাগুলো বসত। সমগ্র তিস্তা-করতোয়া সমভূমি ও তরাইয়ের পার্বত্য সানুদেশের জনপদগুলো যুক্ত হত এইসব মেলাকে কেন্দ্র করেই। এই গুরুত্বপূর্ণ জনসম্মিলনে নিম্নবঙ্গ ও ভুটান, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত ব্যাপারীরা বিপণনসামগ্রী নিয়ে হাজির হতেন। বিকিকিনি হত, মাঝে থাকত স্থানীয় লোকসংস্কৃতির প্রদর্শন, মেলার কেন্দ্রবিন্দু বাণিজ্য হলেও মেলা জমে উঠত পালাটিয়া, বিষহরা, মুখানৃত্যের গ্রামসংস্কৃতির আবহে।

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

রাসমেলার রস ও রোমাঞ্চ

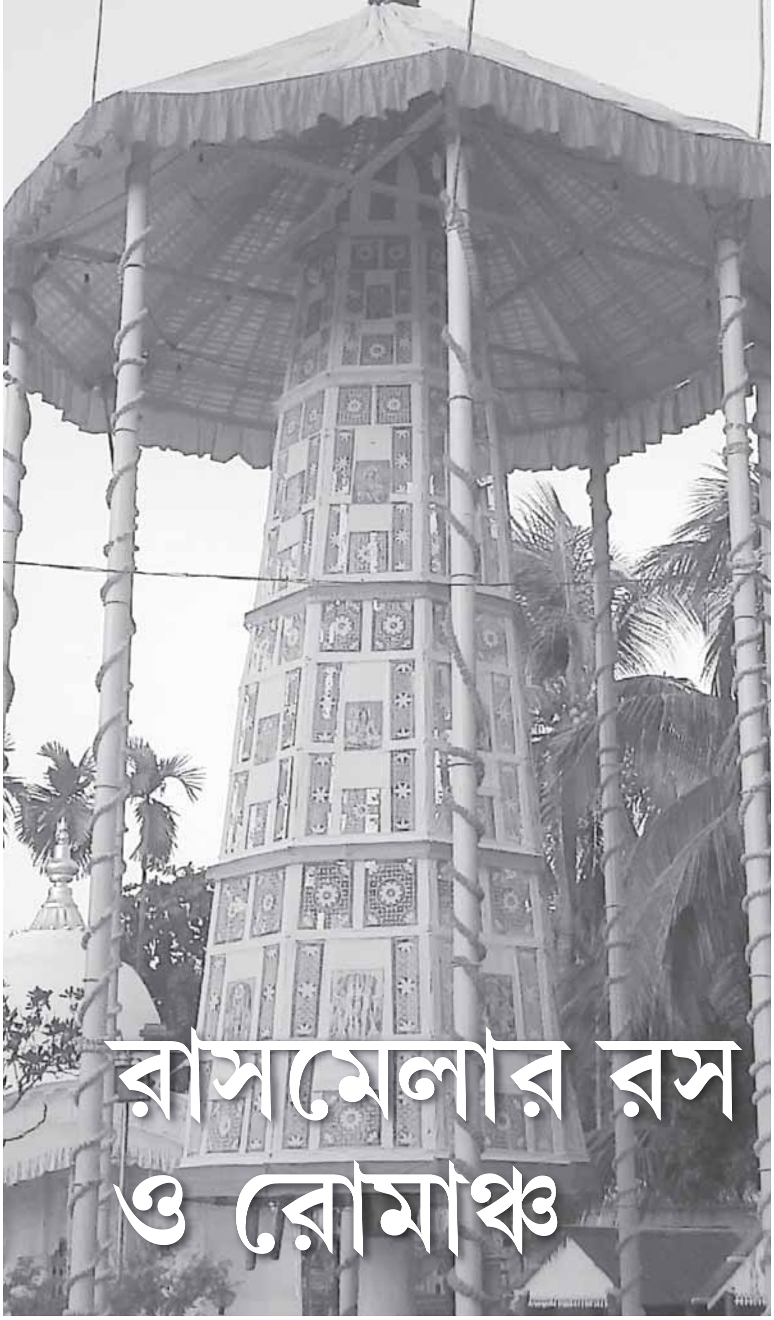

হঠাৎ নীরার জন্য

এ সময় বিকেলটা বড্ড দ্রুত ফুরিয়ে আসে। রাজবাড়ির পিছনে সূর্যের রং গড়িয়ে যেতেই হিমেল হাওয়ার স্পর্শ। স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে গুটিগুটি বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে পড়ে যায় নীরার কথা— 'শেষ বিকেলের সেই ঝুল বারান্দায় তার মুখে পড়েছিল দুর্দান্ত সাহসী এক আলো'। কত হাত ছুঁয়েছিল উলটো দিকের কত হাত নির্জনে, কত-শত প্রথম প্রেমের রোমাঞ্চ সঞ্চিত আছে এই 'নীরা'র কেবিনে। জীবনের প্রথম কাঁটা-চামচ ধরা কিংবা মোগলাই পরোটার অভিজ্ঞতা আজও বুকের মধ্যিখানে জমিয়ে রেখেছে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোচবিহারের কত মানুষ। ফুরিয়ে আসা দিনের আলোর সঙ্গে তাল রেখে আজও জ্বলে ওঠে 'নীরা'র আলো। আর মনের কোণে জানান দেয়— রাসমেলা আসন্ন।

বারো মাসে চোদ্দো পার্বণ

সেই কোন কালে কোচবিহারের মহারাজারা মদনমোহনের রাস উৎসবের সূচনা করেছিলেন, সঙ্গে তাকে ঘিরে মেলা— আজ এতগুলো বছর পার হয়ে গিয়েও সেই রাসযাত্রা আর রাসমেলার জনপ্রিয়তায় এতটুকু ভাটা পড়েনি। সময়ের সঙ্গে রাসমেলার কিছুটা চারিত্রিক পরিবর্তন হলেও, আমূল কোনও পরিবর্তন যে হয়নি তা হলফ করে বলা যায়। কথায় আছে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। কিন্তু কোচবিহারে তো বারো মাসে চোদ্দো পার্বণ। সেখানে সবচেয়ে বড় উৎসব হল মদনমোহনের রাসযাত্রা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এই রাসমেলা। গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে রাসকে কেন্দ্র করে এত বড় মেলা আর কোথাও হয় বলে জানা যায় না। মেলার রাজ্যে তাই কোচবিহারের রাসমেলা এক এবং অনন্য। দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-জাতি-গরিব-বড়লোক নির্বিশেষে সকলে এই মেলায় আসে অন্তরের টানে।

দেশীয় রাজ্য থেকে অঙ্গরাজ্য: ইতিহাসের সাক্ষী

তিনশো বছরের বেশি বয়স বলে অনুমান এই রাসযাত্রার। তাকে ঘিরে ছোট্ট মেলা। সেই সময় কোচবিহারের রাজধানী যেখানে যেখানে স্থানান্তরিত হত, রাস উৎসবও সেই সেই জায়গায় হত। পরবর্তীতে কোচবিহারের বর্তমান রাজবাড়ি নির্মাণের পর সেখানেও রাস উৎসবের কথা জানা যায়। এর পর আরাধ্য দেবতা মদনমোহনকে রাজবাড়ি থেকে বৈরাগী দিঘির উত্তরে মদনমোহন বাড়িতে স্থানান্তরিত ও স্থাপনের পর রাস উৎসব সেখানেই স্থায়ীভাবে শুরু হল। তখন বৈরাগী দিঘির চারধার দিয়ে বসত মেলা। দোকানিরা তাদের পসরা সাজিয়ে নিয়ে আসত বিভিন্ন প্রান্ত থেকে— চলত বিকিকিনি।

ধীরে ধীরে মেলার অবয়ব ও আকৃতির পরিবর্তন হল। মদনমোহন বাড়ির সামনে থেকে শুরু করে লাইনের মাঠ (বর্তমান রাসমেলার মাঠ)-এ ছড়িয়ে পড়ল রাসমেলা। সে সময় স্টেডিয়াম ছিল না, ফলে গোটা মাঠ জুড়ে বসত মেলা। শুধু কোচবিহার নয়, পার্শ্ববর্তী শহর ও রাজ্য থেকেও লোকে এই রাসমেলার আকর্ষণে ছুটে আসত এখানে। এরই মধ্যে পটপরিবর্তন হয়েছে কোচবিহারের। দেশীয় রাজ্য থেকে ভারতভুক্তি, পশ্চিমবঙ্গভুক্তি— সব কিছুর সাক্ষী কিন্তু এই রাসমেলা, যা প্রাচীন হয়েও সমকালীন।

রাসমেলা মানেই কোচবিহার

শুনতে অবাক লাগলেও বাস্তব এটাই। আগেও রাসমেলার আকর্ষণে বাইরে থেকে লোক আসত, তেমনই রাসমেলাকে অনুভব করতে বহু মানুষ আজও কোচবিহারমুখী হয়। রাসমেলার সময় এখানকার প্রায় সব বাড়িতেই 'সাগাই' বা আত্মীয়-পরিজনের আসা খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। এখনও সেই ধারা বিদ্যমান। সকলের অবশ্য সেই

সুযোগ ছিল না। পার্থক্য একটাই, সে সময় যোগাযোগব্যবস্থা তেমন না থাকায় দূরদূরান্ত থেকে রাসমেলায় মানুষ আসত গোরুর গাড়িতে চেপে। সঙ্গে অনেক সময় থাকত রান্নার সামগ্রী। বর্তমানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, গার্লস হস্টেল, কোচবিহার ক্লাব, সেখানে সার দিয়ে রাখা থাকত গোরুর গাড়ি। তখন তো কোচবিহারে এত হোটেল ছিল না। মানুষজন ছৌ দেওয়া গাড়িতে এসে মেলা ঘুরে, রান্নাবান্না-খাওয়াদাওয়া করে সেখানেই ঘুমিয়ে নিয়ে পরদিন মেলা ঘুরে বাড়ির পথ ধরত। অনেকে মদনমোহন বাড়ির যাত্রাপালা দেখে সারারাত কাটিয়ে দিত। অনেকে থাকত রাসমেলার অস্থায়ী হোটেলে। জানা গেল, স্থানীয় তৃপ্তি হোটেল, জয় গুরু হোটেল রাসমেলায় খাওয়ার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে থাকারও ব্যবস্থা করত। মাটিতে বাঁশের মাচা বানিয়ে তাতে খড়-বিচুলি দিয়ে তার উপর চট বিছিয়ে বিছানা বানানো হত। সেইসব হোটেলে যাঁরা খেতেন, তারাই থাকার সেই সুযোগটা পেতেন বলে জানালেন তৃপ্তি হোটেলের বর্তমান মালিকদের একজন তপন সরকার। তাঁর বাবা অনিলকুমার সরকার রাসমেলায় হোটেল দিতেন প্রতি বছর। তবে প্রায় ৪০ বছর হল তাঁরা আর হোটেল দেন না রাসমেলায়। সে সময়ও খাবারের হোটেলের নির্দিষ্ট একটা লাইন ছিল। আজও হোটেলের নির্দিষ্ট লাইন রয়েছে। কিন্তু সেখানে আর থাকার কোনও বন্দোবস্ত নেই। আজও কিন্তু রাসমেলা দেখতে মানুষ ভিড় করে কোচবিহারে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রাসমেলার জন্য এই ১৫ দিন কোচবিহারের ছোট-বড়-মাঝারি কোনও হোটেলেই থাকার জায়গা পাওয়া অসম্ভব। এখন যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। বহু মানুষ সকালে এসে সারাদিন মেলাবাড়ি ঘুরে, খাওয়াদাওয়া, কেনাকাটা করে সন্ধ্যায়, এমনকি রাতেও নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারে। রাসমেলা উপলক্ষে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ সংস্থা বাড়তি বাসেরও ব্যবস্থা করে আজকাল। গোরুর গাড়ি আজ গল্পকথা।

দই-চিঁড়ে থেকে চিকেন ফ্রাই

ভাতের হোটেল ছাড়াও সে সময়ের রাসমেলায় ছিল নানান ধরনের খাবার দোকান। বৈরাগী দিঘি আর পূর্ত দপ্তরের মাঝের অংশে বসত দই-চিঁড়ের দোকান। অ্যালুমিনিয়ামের থালায় সেই খাবার ভরপেট খেয়ে নিশ্চিন্ত মনে মেলা ঘুরত গ্রামের মানুষ। সেসব দোকান আজ দেখা যায় না। থাকত খিচুড়ির দোকান, প্রতি প্লেট ১০ পয়সা। ঘুগনির দোকান অবশ্য আজও বসে, তবে চাট ভাণ্ডার নামে। তাদের সংখ্যাও বেড়েছে প্রচুর। এখনও একটা লাইনই হয় জিলিপির। বিশেষত ভেটাগুড়ির জিলিপি। অসম্ভব রকমের জনপ্রিয়। বহু আগে অবশ্য ভেটাগুড়ি নয়, এখানে জিলিপির দোকান দিতেন স্থানীয় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরাই। পাশাপাশি জনপ্রিয় ঢাকাই পরোটা। ছোট থেকে আজ পর্যন্ত সেই পরোটার মায়া কাটাতে পারেননি কুমার মানবেন্দ্র নারায়ণ। ছোট ছোট হোটেলের বাইরে অদ্ভুত লাল রঙের ডিমের কারি আজও সাজানো থাকে রসনা উদ্রেকের জন্য, ছোটবেলার সেই রসনাতৃপ্তির সাহস এই বয়সেও দেখাতে পারলাম না— এই আক্ষেপ যাবার নয়। আজও যাওয়া-আসার পথে সেদিকে তাকিয়ে থাকি করুণ দৃষ্টিতে। আর-একটা মজার কথা না বললেই নয়, সে সময় নাকি তরুণ হোটেলের বাইরে অতিকায় এক কাতলা মাছের মাথা ভেজে রাখা হত রাসমেলায় আগত ভোজনরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। ছোটবেলায় সেই মাছের মাথার উপর যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল বলে জানালেন কোচবিহারের প্রবীণ নাগরিক ও লেখক নৃপেন পাল। আজ আর সেই দৃশ্য চোখে পড়ে না।

বাৎসরিক কেনাকাটার পক্ষকালব্যাপী সুপারমার্কেট

আশি ছুঁইছুঁই দীপক ব্রহ্ম রাসমেলার কথা বলতে বলতে চলে গেলেন নিজের ছেলেবেলায়। জানালেন, তখন একটা মজার ব্যাপার দেখা যেত। গ্রাম থেকে যাঁরা রাসমেলা দেখতে আসতেন, তাঁরা নিজেরা যাতে এত ভিড়ে হারিয়ে না যান, তার জন্য একে অপরের শাড়ির আঁচলে গিঁট বেঁধে রাখতেন। এভাবে সাত-দশজনের বাচ্চা-বুড়ো-মহিলার একেকটি দল মেলা

গ্রাম থেকে যাঁরা রাসমেলা দেখতে আসতেন, তাঁরা নিজেরা যাতে এত ভিড়ে হারিয়ে না যান, তার জন্য একে অপরের শাড়ির আঁচলে গিঁট বেঁধে রাখতেন। এভাবে সাত-দশজনের বাচ্চা-বুড়ো-মহিলার একেকটি দল মেলা ঘুরে বেড়াত নিশ্চিন্ত মনে। বছর পঞ্চাশ আগেও এই দৃশ্য বিরল ছিল না।

ঘুরে বেড়াত নিশ্চিন্ত মনে। বছর পঞ্চাশ আগেও এই দৃশ্য বিরল ছিল না। আরও একটা অজানা কথা উঠে এল তাঁর স্মৃতিচারণে। সে সময় সোনা-রুপোর গয়নার দোকান বসত রাসমেলায়। দার্জিলিং থেকে আসত দার্জিলিং টেলর— কোট-প্যান্ট বানানো হত সেখানে। আর আসত দার্জিলিং স্টোনের গয়না। বর্তমানে সোনা-রুপোর গয়নার দখল নিয়েছে বিভিন্ন কোম্পানির মাইক্রোগোল্ড, আর দার্জিলিং স্টোনের জায়গায় ইমিটেশন ও জাঙ্ক জুয়েলারি।

এসব আধুনিক জিনিসপত্রের পাশাপাশি সাধারণ ঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় বা গ্রামীণ জিনিসপত্রও সমান জনপ্রিয় ছিল। চাষবাসের সামগ্রী থেকে শুরু করে বঁটি, সাঁড়াশি, বেলন-চাকি সব কিছুই পাওয়া যেত এখানে। এই দোকানের সারি আজও রয়েছে, চাহিদাও এতটুকু কমেনি। মদনমোহন বাড়ির সামনে দিয়ে একটানা বসত ঠাকুরের বাসন ও পাথরের থালা-বাটি, পাথরের শিবলিঙ্গর

দোকান। এখনও বসে, তুলনামূলকভাবে কম।

বাসনপত্রের দোকান আগে যতটা চোখে পড়ত, এখন ততটা দেখা যায় না। কিছু বছর আগে পর্যন্ত একটা সারিই থাকত কাঁসা-পিতলের বাসনের জন্য। দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে বাধ্য। এখন মাত্র কয়েকটি দোকান আসে। সেই তুলনায় আজকাল জনপ্রিয় স্টিল আর মেলামাইনের বাসনপত্র। বাংলাদেশ থেকে দোকানিরা তাঁদের বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে কয়েক বছর হল হাজির হচ্ছেন রাসমেলায়। সেখানে শুঁটকি মাছ, নোনা ইলিশের পাশাপাশি ঢাকাই জামদানি, বাংলাদেশের গামছা আর বাংলাদেশি মেলামাইনও বেশ জনপ্রিয়।

একসময় বাইরে থেকে স্টুডিয়ো আসত এই মেলায়। সেটা ১৯৭২ হবে, সদ্য বিয়ের পর রাসমেলায় ছবি তুলেছিলেন যুগলে। তখন রাসমেলার স্টুডিয়োতে ছবি তোলার বেশ রেওয়াজ ছিল। বললেন নির্মলেন্দু চক্রবর্তী। দল বেঁধে রাসমেলা ঘুরে বন্ধুরা মিলে এই স্টুডিয়োতে যেত ছবি তুলে স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। আজও অনেকেরই পুরনো অ্যালবাম খুঁজলে এই ছবি পাওয়া যাবে। বর্তমান সেলফির যুগে এই ঘটনা যে বিস্ময় জোগাবে জেন-এক্সকে তা বলাই বাহুল্য।

হারিয়ে গিয়েছে পুতুলনাচ-ইন্দ্রজাল-সবজি রাক্ষস

একসময় মেলায় আসত পুতুলনাচের দল। আজ সেই জায়গায় চিত্রহার— বিভিন্ন অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে জনপ্রিয় গানের সঙ্গে নাচ দেখিয়ে এক শ্রেণির দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। ইন্দ্রজাল আজ আর আসে না। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেও যা দেখে অনেক শিশুই বিস্ময়ে অবাক ও মুগ্ধ হত। এখন ম্যাজিকের স্টল বসে। বিভিন্ন বয়সি

সে সময় জন্তুজানোয়ার নিয়ে সরকারি কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। তাদের প্রচুর খেলা দেখা যেত। সুন্দর সুবেশ তরুণ-তরুণী নানা ভঙ্গিমায় খেলা দেখাত। ট্রাপিজের খেলা, জোকারের দুষ্টুমি— সব দর্শকদের মন ভরিয়ে দিত। এক সময় দ্য গ্রেট বম্বে সার্কাসের রেবা রক্ষিতের খেলা ছিল ভীষণ জনপ্রিয়। দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে দেখতেন হাতি তাঁর বুকের উপর দিয়ে কীভাবে হেঁটে চলে গেল।

বাচ্চারা ভিড় করে ম্যাজিক দেখে কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরে ঘরোয়া আসরে পি সি সরকার জুনিয়র হয়ে যায়। আরও আগে ছিল টিনের বাক্সের বায়োস্কোপ। সেখানে হাত দিয়ে লাঠির মতো একটা জিনিস ঘোরালে বাক্সের ভিতরে বিভিন্ন ছবি দেখা যেত। ছন্দের তালে তালে ছড়া কেটে এই বায়োস্কোপ দেখানো হত। বাক্সের ফুটোতে চোখ লাগিয়ে সেইসব ছবি দেখার মজাই ছিল আলাদা। আর ছিল সমীরণের কথা-বলা পুতুল। তাকে দেখে দর্শকদের আশ আর মিটত না। সেই কথা-বলা পুতুল আজ আর রাসমেলায় আসে না।

মৃত্যুকূপ সেকালেও ছিল, একালেও আছে। কিন্তু দেখা মেলে না সেই সবজি রাক্ষসের। যে অবলীলাক্রমে কাঁচা কাঁচা সবজি এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলত। তেমনি হারিয়ে গিয়েছে রাসমেলায় ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁদর নাচ, মাদারির খেলা।

একসময় রাসমেলায় আসত মিনি চিড়িয়াখানা। সেখানে বিভিন্ন জন্তুজানোয়ারের পাশাপাশি একটা সাপ অন্তত থাকবেই। তবে হাতি থাকত না ওই চিড়িয়াখানায়।— জানালেন শুভাশিস ভট্টাচার্য। আর ছিল আয়নাঘর। বিভিন্ন উত্তল-অবতল কাচের সামনে নিজেকে দেখে দর্শকরা হাসি সামলাতে পারতেন না। সেই আয়নাঘরের আসা এখন অনিয়মিত। পা দিয়ে রুটি বেলা দেখতে দর্শকরা ভিড় করতেন একটি স্টলে। এত নিখুঁত আর গোল হত সেই রুটি, যা হাতে বানানো রুটিকেও হার মানায়। বহু বছর হয়ে গেল সেই স্টল আর আসে না। আর-একটা আকর্ষণ ছিল গঙ্গা-যমুনা— দু'টি মাথা, চারটি হাত— দু'টি দেহ একসঙ্গে জোড়া দুই বোন। তারা আজ আর জীবিত কি না জানা নেই।

এখন রাসমেলা ঘুরতে গিয়ে দূর থেকে চোখে পড়বেই বিভিন্ন ধরনের নাগরদোলা। প্রায় আকাশকে ছুঁইয়ে মাটিতে নামছে গোল হয়ে। বিদ্যুৎ চালিত এই নাগরদোলার লাইনে ঢুকতে গেলে এখন বেশ কসরত করতে হয়। আলো ঝলমল চারদিক, বিভিন্ন রকমের আওয়াজ, সঙ্গে দর্শকদের আকর্ষণের জন্য মাইকে হিন্দি গান। আগে এই নাগরদোলা ছিল না। লোহার হাতল ধরে বসতে হত পুতুল, ঘোড়া, বাঘের পিঠে। বড়দের জন্য বাক্সের মতো বসার জায়গাও থাকত। হাতল দিয়ে হাতে ঘোরানো হত সেই নাগরদোলা। লম্বা বন্দুক দিয়ে বেলুন ফাটানোর দোকান রাসমেলার অন্যতম আকর্ষণ। এখানে নিশানা পরখ করে অনেকেই মনে মনে নিজেকে জিম করবেটের সমগোত্রীয় ভেবে আজও গর্বিত হন।

মেরা নাম জোকার

একসময় কোচবিহার রাসমেলায় আসত নামকরা সব সার্কাস পার্টি। দ্য গ্রেট বম্বে সার্কাস, অমর সার্কাস, কমলা সার্কাস, নটরাজ সার্কাস। তারা তাঁবু ফেলত রাসমেলার আগে থেকেই। বেশির ভাগ সময় রাসমেলা শেষ হয়ে যাবার পরও সার্কাস থেকে যেত। মেলায় কম করে দুটো বড় সার্কাস তো আসতই। এখন সার্কাস এলেও তেমন উন্নতমানের নয়। সে সময় জন্তুজানোয়ার নিয়ে সরকারি কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। তাদের প্রচুর খেলা দেখা যেত। সুন্দর সুবেশ তরুণ-তরুণী নানা ভঙ্গিমায় খেলা দেখাত। ট্রাপিজের খেলা, জোকারের দুষ্টুমি— সব দর্শকদের মন ভরিয়ে দিত। এক সময় দ্য গ্রেট বম্বে

সার্কাসের রেবা রক্ষিতের খেলা ছিল ভীষণ জনপ্রিয়। দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে দেখতেন হাতি তাঁর বুকের উপর দিয়ে কীভাবে হেঁটে চলে গেল। বাবার সঙ্গে গিয়ে সেই খেলা দেখার অনুভূতির কথা এখনও মনে আছে রত্না চক্রবর্তীর। ১৯৬১/৬২ সালে একবার খেলা শেষ হওয়ার আগে তাঁবু খুলতে শুরু করার অপরাধে উত্তেজিত জনতা অমর সার্কাসের তাঁবু পুড়িয়ে দিয়েছিল। এই কারণে সেবার কার্ফু জারি হয়েছিল।— জানালেন এক প্রবীণ। আগে সার্কাসের হাতি সকালের দিকে শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়াত তার মাহুতের সঙ্গে। তখন এত বাড়িঘর না থাকায় প্রচুর ফাঁকা জমি ছিল। আর ছিল কলা গাছ। একদিকে সার্কাসের প্রচার, অন্য দিকে হাতির খাদ্য সংগ্রহ— দুইই হত এই নগর পরিক্রমায়। সার্কাসের উপর ঘুরত সার্চলাইট। বর্তমানে সার্কাস তার আকর্ষণ হারিয়েছে।

টমটম-কাঠের খেলনা: রাসমেলা স্পেশাল

রাসমেলা মানেই টমটম গাড়ি। রাসমেলায় গিয়েছে অথচ টমটম গাড়ি কেনেনি, এমন বাচ্চা বিরল। ১৯৪২ সাল থেকে বিহারের মুঙ্গের থেকে মেলায় এই গাড়ি বিক্রি করতে আসতেন মহম্মদ শেখ আজাহার। বছর চারেক হল মেলায় তাঁর দেখা নেই। মেলায় দেখা মেলে বাঁশের বাঁশির। এই বাঁশির সুরে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকে কেনে ঠিকই, পরবর্তীতে তাতে ফুঁ দিয়ে চৌরাশিয়ার ধারেকাছেও আর আসা হয় না। কিছুদিন আগেও ফুলের চারা বা

নার্সারির বেশ রমরমা ছিল, আজ হাতে গোনা। হাওয়াই মিঠাই এখনও জনপ্রিয়। বাদাম ভাজা, ছোলা ভাজা থাকলেও বর্তমানে পপকর্ন একটু এগিয়ে। বেনারসি পানের দোকান আজও আসে। তবে প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে সেই ডালমুট ভাজার দোকানগুলো। এক অদ্ভুত শৈলীতে পাহাড়ের মতো উঁচু জায়গা থেকে বিরাট এক লম্বা হাতা দিয়ে বিভিন্ন খোপে রাখা নানান ভাজা তুলে একসঙ্গে মিশিয়ে ডালমুট মাখা বানিয়ে দিত এক অসীম দক্ষতায়। চিনির হাতি, চিনির ঘোড়ার দোকান চোখে পড়ে শুধু মদনমোহন বাড়ির সামনে। আচার, হজমি, চালকুমড়োর মোরব্বার দোকান আগে কম ছিল, এখন অনেক বেশি দেখা যায়। আর ছিল হরেক মালের দোকান। সব জিনিসেরই এক দাম। কী পাওয়া যেত না সেখানে! এখনও অবশ্য প্রচুর আধুনিক হরেক মালের দোকান বসে, তবে সেই চাহিদা আর নেই।

কাঠের দোকানের কথা না বললেই নয়। বিভিন্নরকম আসবাবপত্রের কত্ত কত্ত দোকান। অনেকে এখানে এনে আসবাব বানিয়ে বিক্রি করত। বার্নিশের সেই গন্ধ নাকে আসত পথচলতি মানুষের। বছরের পর বছর বসছে দোকানগুলো। সেখানে ছোট ছোট কাঠের খেলনা আগে বেশ দেখা যেত— কাঠের ট্রাক, ছোট আলনা খাট, পুঁচকে ড্রেসিং টেবিল, আরও কত কী। আমাদের মতো অনেকেরই মেয়েবেলার রান্নাবাটি পুতুল খেলার ঘরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অমূল্য জিনিস। প্লাস্টিকের খেলনার দাপটে আজকাল আর তেমন চোখে পড়ে না। তেমনই কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বহুকাল আগে থেকে আসে। তবে মাটির ছোট ছোট খেলনাবাটি আজ আর চোখে পড়ে না। দিনহাটা থেকে আসত দিনহাটা টয়েজের দোকান। এখন মেলা জুড়ে কত খেলনার দোকানের সারি, উধাও শুধু মাটির খেলনাপাতি।

মদনমোহন বাড়ির সোজা রাস্তায় মা ভবানী বিড়ি আর মর্নি ফ্রেশ-এর যে বড় গেট হত, তার মাথায় থাকত সিংহের মুখ। সে আবার হাঁ করে গর্জন করত— মুখের ভিতরটা লাল। সেই সিংহের মাথা একবার বাইরে আসত, একবার ভিতরে ঢুকত। প্রায় তিরিশ বছর আগে যারা ছোট ছিল, এই দৃশ্য তাদের কাছে যে ভয়মিশ্রিত আনন্দ দিত তা বলাই বাহুল্য।

কাশ্মীর কি গলি

রাসমেলার মস্ত আকর্ষণ হল কাশ্মীরি শাল। অবশ্যই মেয়েদের। তবে সেই আকর্ষণের কতটা শালের প্রতি আর কতটা শালওয়ালাদের প্রতি তা প্রশ্নসাপেক্ষ। সেইসব সুদর্শন শালওয়ালাকে চোখে দেখবার জন্য স্কুল ফেরত মেয়েদের শালের লাইন দিয়ে ঘন ঘন যাওয়া-আসা, অকারণে দরদাম করা, চোখে একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে তাদের দেখা, সেই অনুভূতি নিজেদের মেয়েবেলা দিয়ে বোঝা যায়। ইদানীং কেন জানি ওই ধরনের সুদর্শন শালওয়ালা মেলায় আর চোখে পড়ে না। যাদের দেখি, তারা আদৌ আসল কাশ্মীরি কি না সন্দেহ হয়। শালের দোকান এখন ছ'মাসই প্রায় কোচবিহারে থাকে। তাই মেলায় দোকানের সংখ্যা কমেছে। অদ্ভুতভাবে মেলায় এখনও প্রচুর বিক্রি তাদের। ভুটিয়াদের আনা চাদর-সোয়েটারের চাহিদাও বেশ। আর-একটা কথা না বললেই নয়, রাসমেলা নিয়ে কথাটা মিথের পর্যায়ে চলে গিয়েছে, তা হল— দুর্গা পুজোতেও যেসব মেয়েকে দেখা যায় না, রাসমেলাতে সেইসব সুন্দরী মেয়ে কোচবিহারে আসে। তাই অল্প বয়সে রাসমেলায় এসে মেয়ে দেখেনি, এমন কথা বুকে হাত দিয়ে বলার মতো লোক খুঁজে পাওয়া ভার হবে। এখনও সেই ট্র্যাডিশন চলে আসছে।

কত যুগ আগে এই রাসমেলাতেই লোকে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবে বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। নিম্ন আসাম, চা-বাগান, আশপাশের জেলার মানুষরা কেনাকাটার অন্য কোনও উপায় না থাকায় এর জন্য দিন গুনত। পরিস্থিতি পালটেছে। এখন সকলের হাতেই স্মার্ট ফোন। যে কোনও জিনিস সুলভে মেলে ঘরে বসে। এই নেটের যুগেও রাসমেলার এমন জমজমাট ব্যাপার অবাক করে বইকি। বিকিকিনি যে হচ্ছে না তা নয়, তবে কেনার চেয়ে খাবার দোকানের প্রতি বেশি ঝোঁক মানুষের। খাবার

তালিকায় ভাপা পিঠে থেকে শুরু করে চাইনিজ, মোগলাই আইটেমের ছড়াছড়ি।

তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের নিজস্ব পাওয়ার হাউজ থাকায় মেলায় বিদ্যুৎ থাকত। তখন অবশ্য বাল্‌বের যুগ। তবে অনেক দোকানে হ্যাজাকও ব্যবহার হত। খোকা পানওয়ালা রাসমেলার মাঠে এই হ্যাজাক সরবরাহ করত বহু বছর। স্মৃতির পাতা হাতড়ে জানালেন আশিসকুমার রায়। এখন রাসমেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব বিদ্যুৎ দপ্তরের। কোচবিহার রাসমেলার সবকিছু ভাল থাকলেও সব চেয়ে দুরবস্থা ছিল শৌচকর্মের। এখন যেখানে গার্লস' হস্টেল, সেখানে সার দিয়ে খাটা পায়খানা করা হত। তা-ও যত্রতত্র শৌচকর্মের ফলে মেলা যতদিন গড়াত, দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হত আশপাশের মানুষদের। বর্তমানে পুরসভা সেই ব্যাপারটাকে অনেকটাই সুবিধেজনক জায়গায় নিয়ে গিয়েছে।

রাসচক্র: বিবর্তনের চালচিত্র

এবার আসি তাঁর কথায়, যাঁকে ঘিরে এই রাসমেলা, সেই মদনমোহন। রাসযাত্রা উৎসবের জন্য মহারাজা দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিলেন বলে জানা যায়। এ বছর উৎসবের বাজেট ১২,৭৯,১৭১ টাকা। এর মধ্যে থেকে পুজোর জন্য খরচ ৫৩,৯০৩ টাকা। ট্রাস্ট সূত্রে জানা গেল, ১৯৯০/৯১ সালে শুধু পুজোর খরচ ছিল ৯,৯০০ টাকা। আগে মদনমোহন বাড়ির রং ছিল সাদা-লালে মেশানো। ১৯৯৯ সালে তা সম্পূর্ণ দুধসাদা রং করা হয়েছে। আগের কালের চেয়ে একটাই পার্থক্য হয়েছে তা হল আলোকসজ্জায়। আগে রাসের সময় এত আলো ঝলমল করত না মদনমোহন বাড়ি— এখন আলোর বন্যায় ভাসে গোটা চত্বর। সেখানে পূতনা আগেও ছিল, এখনও আছে, যা শিশুদের আকর্ষণ করে। রাসযাত্রার কেন্দ্রবিন্দু হল রাসচক্র। সংস্কারবশত এটা ঘোরানো না হলে মনে হয় কী যেন অপূর্ণ থেকে গেল। এই রাসচক্র বংশপরম্পরায় তৈরি করে আসছে এক মুসলমান পরিবার। মন্দির চত্বরের ছোট ছোট পুতুলের ঘরগুলোতে আগে বাল্‌ব জ্বলত, এখন পিএল জ্বলে। আগে রাস উদ্‌বোধন করতেন কোচবিহারের মহারাজা স্বয়ং। এখন সে দায়িত্ব নিষ্ঠাভরে পালন করেন জেলাশাসক। মন্দিরের ভিতরে এখনও যাত্রাপালার আসর বসে। পালা-কীর্তন হয়। শহরের লোক কিছুটা কম হলেও এখানে গ্রামীণ দর্শক ও শ্রোতারা এসব বেশ উপভোগ করেন। চিরাচরিত প্রথা মেনে একইভাবে মদনমোহনের রাস উৎসবের সব আয়োজন করে আসছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড। আগে মেয়েদের জন্য 'সর্না' প্রথা চালু ছিল, ওই দিন সে সময় মন্দিরে পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। কালের নিয়মে তা বিলুপ্ত হয়েছে। কিছুদিন আগেও রাসমেলার সময় সাধুরা এসে ভিড় জমাত মন্দিরের বাইরে। নিজেরাই রান্না করে খেত, পাশাপাশি চলত গঞ্জিকাসেবন। এখানে যোগ দিত বহু ভিন্ন বয়সি পুরুষরা। বর্তমানে নিরাপত্তার কারণে রাস্তা আটকে দেওয়ায় তাদের আর দেখা মেলে না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মীরা।

> বাংলাদেশ থেকে দোকানিরা তাঁদের বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে কয়েক বছর হল হাজির হচ্ছেন রাসমেলায়। সেখানে শুঁটকি মাছ, নোনা ইলিশের পাশাপাশি ঢাকাই জামদানি, বাংলাদেশের গামছা আর বাংলাদেশি মেলামাইনও বেশ জনপ্রিয়।

আগে রাসমেলায় যত দোকান বসত, দিন দিন দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মেলা এখন আর শুধু রাসমেলার মাঠেই সীমাবদ্ধ নেই। আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক সব ধরনের দোকান এখনও স্টলের জায়গা পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। বর্তমান রাসমেলা আকারে যা বেড়েছে, তাতে পুলিশ প্রশাসনকে অসম্ভব সজাগ থাকতে হয়। মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ও পরিচালনা করার জন্য কোচবিহারের বাইরে থেকেও ফোর্স আনাতে হয় বলে জানালেন পুলিশ সুপার অনুপকুমার জয়সওয়াল। চারদিকের নাশকতা, জঙ্গি হামলা ইত্যাদির জন্য এই কয়েকদিন প্রচণ্ড কড়াকড়ি করা হয়। যানবাহন নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে মেলায় ঢোকা-বেরনোতে ব্যবহার করা হয় মেটাল ডিটেক্টর। বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয় সিসিটিভি ক্যামেরা। মেলায় থাকে সহায়তার জন্য পুলিশ ক্যাম্প। 'মেলা পুলিশ ক্যাম্প থেকে বলছি, একটি চার বছরের বাচ্চা ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'— এ ধরনের ঘোষণা মেলা ঘুরতে আসা সকলের কাছেই ভীষণ পরিচিত ব্যাপার।

২০১২-য় পৌরসভা পরিচালিত রাসমেলার ১০০ বছর পূর্ণ হয়েছে। এত বছর ধরে একইভাবে হয়ে আসছে এই মেলা। এখানে প্রাচীন-আধুনিক সবকিছুই মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েও এই মেলা আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। কর্মসূত্রে বা বিবাহসূত্রে যাঁরা কোচবিহার ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাঁরা আজও ভীষণভাবে মিস করে এই রাসমেলাকে। মাত্র একবার কোচবিহারে কলেরা মহামারীর আকার নেওয়ায় রাসমেলা বন্ধ ছিল। সেটা ১৯২৩ সাল।

আরও একবার রাসমেলা বন্ধ হবার উপক্রম হলেও শেষ পর্যন্ত হয়েছিল। সেবার ভারত-চিন যুদ্ধ, ১৯৬২ সাল, ব্ল্যাক আউট। রাসমেলা হয়েছিল হ্যাজাকের আলোয়। আগে রাসমেলায় বেশ শীত পড়ে যেত। আবহাওয়ার পরিবর্তনে সেই শীত ভাব আর নেই। রাসমেলা আছে, রাসমেলা থাকবে। যতদিন কোচবিহার আছে, ততদিন রাসমেলা চলতে থাকবে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম বেয়ে। হয়ত বাহ্যিক কিছুটা পরিবর্তন আসবে— অন্তরের সুর একই থেকে যাবে।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

ছবি: সাত্যকি বিশ্বাস ও প্রতিবেদক

শিলিগুড়ির মানুষ রাজনৈতিক নেতাদের কদর্য ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে ক্লান্ত, ক্ষুব্ধ

শিলিগুড়ি পুর এলাকা তথা বৃহত্তর শিলিগুড়ির বাড়ির আদরের খোকার নানা নামের মতন একেকজনের মুখে চলত। কেউ কানা ছেলের পদ্মলোচনের নামের মতন নাম দিয়েছে উত্তরবঙ্গের রাজধানী। কেউ ডাকে স্মাগলিং-এর নয়া হংকং। কারও ডাক, প্রায় চল্লিশ হাজার রিকশার আনাগোনায় এটি বাংলার রাজধানী পশ্চিমবঙ্গের ঢাকা। দক্ষিণের বেঙ্গালুরু তার শিল্পের কৌলীন্যে 'প্রাচ্যের সিলিকন ভ্যালি'র নামকরণের মুকুটে অভিষিক্ত হলেও শিল্পবন্ধ্যা হিমালয়ের পাদদেশের শিলিগুড়ি শহরই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? দার্জিলিং মোড় থেকে শিলিগুড়ির হিলকার্ট ধরে এনজেপি পর্যন্ত কাছিমের চলার গতিকে লজ্জায় ফেলে দিয়ে যানজট শিলিগুড়িকে একটা সান্ত্বনা দেয়। শিল্প তথা প্রযুক্তির রাজধানী বেঙ্গালুরুর যানজট। তাই সিলিকন ভ্যালি নাম না দিতে পারলেও একে যানজটের জন্য আদরের নাম দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গের বেঙ্গালুরু। এত বড় শহর, লোকসংখ্যা দশ লক্ষের দরজায় পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা। কয়েক লক্ষ মানুষ, জেলাগুলির বহু মানুষ নানা কাজে আসে। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে সারা দেশ থেকে তো বটেই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েন। অথচ এই শহরে নেই কোনও পয়ঃপ্রণালী ও সাধারণের ব্যবহারের শৌচালয়। শহরটির জায়গায় জায়গায় 'এখানে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ' টাঙিয়ে প্রমাণ করা হয়, শহরটি প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগের উন্মুক্ত শহর।

১৮৮১ সালে শিলিগুড়ি মৌজাসহ কিছু এলাকা জলপাইগুড়ি থেকে নিয়ে এসে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত করে তৎকালীন তরাই মহকুমার সদর দপ্তর হাঁসখাওয়া থেকে সরিয়ে এনে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। তার আগে এই শিলিগুড়ি মানুষের কাছে প্রায় অশ্রুত ও অজানা এক ক্ষুদ্র মৌজা রূপে ছিল এর অবস্থান। ১৯০১ সালে এর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭৮৪। আজ এই শিলিগুড়ি শহর সেই বহুল প্রচারিত বিজ্ঞাপনের মতন ঘোষণা করতে চাইছে, 'এই দেখো, কেমন আমি বাড়ছি।' বাড়ছে শিলিগুড়ি। এতে কোনও সন্দেহ নেই। নগর থেকে উত্তরণের সিঁড়ি বেয়ে মহানগরীর স্বপ্ন দেখে। অথচ সেই সম্ভাবনাকে এখানকার রাজনৈতিক সংকীর্ণতার যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে রাজনৈতিক দল ও নেতারা রাজনৈতিক সিংহাসন দখলের ক্ষমতায় লিপ্ত রয়েছে। এই শহরের নগরবাসীর জীবন যে পুর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে এই দুঃস্বপ্নের নগরীর বাসিন্দারা রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিই মনের কোণে একরাশ ঘৃণার স্তূপ জমা করে চলেছে তা রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতার কুরুক্ষেত্রের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে বুঝতে পারছেন না।

দূরবীন

বিগত নির্বাচনে তৃণমূলের অপ্রতিহত অশ্বমেধের বিজয়ী ঘোড়ার লাগামকে শিলিগুড়ির নির্বাচকমণ্ডলী এভাবে টেনে ধরবে তা তৃণমূলের কি রাজ্যস্তরের কি জেলাস্তরের কেউ ভাবতে পারেননি। ফলে তৃণমূল বিরোধী সিপিএমের নেতৃত্বে শিলিগুড়ি পুরসভা ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ দখলের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একেবারে নিজস্ব প্রার্থী

বাইচুং ভুটিয়ার নির্বাচনে জয়ী হবার প্রশ্নে তিনি এতখানি নিশ্চিত ছিলেন যে, লোকসভা নির্বাচনে বাইচুং ভুটিয়ার পরাজয়ের পরেও তাঁকে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিলেন। অন্য প্রায় সব বিধানসভার নির্বাচকমণ্ডলী তৃণমূল নেত্রীর প্রতি তাঁদের আস্থা দেখালেও শিলিগুড়ির ভোটদাতারা এর আগের নির্বাচনে পরাজিত মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যকে শিলিগুড়ি পুরসভা ও বিধানসভা উভয় নির্বাচনে বিজয়ী করে সেই আস্থার বিপরীত পথে হেঁটেছেন। গণতন্ত্রে এটাই স্বাভাবিক ও সুস্থতার লক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গে যে গণতান্ত্রিক পরিবেশে এবারের নির্বাচন হয়েছিল, এটা তারই প্রমাণ। যেখানে সবাইকে এক সুরে শাসকের সমর্থনে কোরাস গাইতে হয়, সেই শাসন একসময় যে ভেঙে পড়ে, তার উদাহরণ কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সেই লৌহপ্রাচীরের একের পর এক পতন। চিন কমিউনিস্ট পার্টির সাইনবোর্ডটাকে বজায় রেখে ট্যাঙ্কের তলায় তিয়েনমিন স্কোয়্যারের প্রতিবাদীদের পিষে সেই রক্তপিচ্ছিল পথকে আপাতত পরিষ্কার করে একনায়কতন্ত্র তথা একদলীয় শাসনকে টিকিয়ে রেখেছে। এই ট্যাঙ্কের নল যে একদিন ঘুরে গিয়ে আজকের শাসকের ক্ষমতার দুর্গে গোলা বর্ষণ করে রুদ্ধ স্বাধীনতার দরজাকে উন্মুক্ত করে দেবে না, সে সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না।

শিলিগুড়ির নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস

> রাজনৈতিক নেতাদের লাভ-লোকসানের এই শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াইয়ে শহিদ হচ্ছেন শিলিগুড়ি পুরসভা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাসহ এই বাণিজ্যিক শহরে নানা কাজের জন্য আগত মানুষ। স্বাধীনতার ৬৯ বছরের সিংহদরজায় উপনীত হয়েও শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গ অবহেলিত হয়ে চিহ্নিত হবার ক্ষোভের ক্ষতকে বুকে বয়ে চলেছে। প্রথম ২২ বছর কংগ্রেসের, পরবর্তী ৩৪ বছর নিরবচ্ছিন্ন বামফ্রন্টের এবং বর্তমানে ৭ বছর তৃণমূলের রাজত্ব।

জোটকে তৎকালীন শাসক সিপিএমের বিরুদ্ধে নির্বাচিত করে তাদের কাছে বিপদের সংকেত পাঠিয়ে ছিল। সে দিনও শিলিগুড়ির মানুষ দেখেছিল, এই রাজ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে ৩৪ বছরের শাসনের দম্ভে রাহুতে পরিণত হওয়া সিপিএম নেতৃত্বের হাত থেকে ক্ষমতাকে কেড়ে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস জোটের হাতে পুরসভার দায়িত্ব তুলে দেওয়ার পর সেই পুরসভার ক্ষমতার কেক দখলের জন্য দুই জোট গোষ্ঠীর মধ্যে কদর্য লড়াই। নির্বাচনের আগে ঘোষণা করা হয়েছিল, সিপিএমের অপশাসনের হাত থেকে শিলিগুড়ি পুরসভাকে মুক্ত করে শহরে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পুর পরিষেবা প্রদান করাই হবে তাদের প্রধান লক্ষ্য। মেয়র বা পুর পদাধিকারী কারা হবে, সেটা তাদের কাছে নগণ্য। অথচ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার পর দেখা গেল, তাদের ভাবনাটাই ১৮০ ডিগ্রি জ্যামিতিক অবস্থানের মতন বিপরীতমুখী হয়ে গেল। মেয়র পদে বসার লড়াইটা হয়ে গেল মুখ্য। এই দ্বন্দ্বে মাসের পর মাস নির্বাচনের পরেও শিলিগুড়ি পুরসভা হয়ে রইল পুর বোর্ডহীন, যদিও বা শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তিতে জোটসঙ্গী কংগ্রেস প্রার্থী গঙ্গোত্রী দত্তকে মেয়র পদে বসানোর পরেও সেই মেয়র হয়ে রইলেন কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ। রাজ্যে এর মধ্যে ঘটে গেল সিপিএমের একচ্ছত্র রাজত্বের অবসান। তবু জোটসঙ্গী কংগ্রেসি মেয়র পরিচালিত পুরসভার প্রতি রাজ্যে নতুন শাসকদলের অসহযোগিতার অভিযোগ জোটসঙ্গী কংগ্রেসের পক্ষ থেকেই উঠে এল।

রাজনৈতিক মহলে কংগ্রেস গঙ্গোত্রী দত্তকে মেয়র পদে মেনে নেওয়ার পিছনেও তৃণমূলে নেতৃত্বের প্রশ্নে অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা ব্যাখ্যা চালু আছে। তৃণমূলে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যোগ দিয়েই এক নেতা এই জেলার তৃণমূলের প্রায় গড়ার সময় থেকে থাকা এক সর্বময় নেতার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিলেন। তিনি তৃণমূলের কাউন্সিলরের মধ্যে মেয়র পদের দাবিতে সবার থেকে এগিয়ে ছিলেন। তিনি মেয়র হলে আগামী দিনে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তাঁর করায়ত্ত হতে পারে— এই আশঙ্কাকে মাথায় রেখে নাকি কংগ্রেসের গঙ্গোত্রী দত্তর হাতে মেয়র পদটি রাখা কম বিপজ্জনক বলে মনে করেই দার্জিলিং তৃণমূল নেতা শেষ পর্যন্ত মেয়র পদে কংগ্রেসের দাবিকে মেনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিলেন। এমনও শোনা যায়, তারা কংগ্রেসি মেয়রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলে সিপিএম সেই অনাস্থার বিরুদ্ধে মেয়রকে বাইরে থেকে সমর্থন জানাবে, সেই ব্যাপারে পুরোপুরি নিঃসন্দিগ্ধ হবার পরই তারা কংগ্রেসের সঙ্গে এই জোট ভেঙে অনাস্থা এনেছিল।

রাজনৈতিক নেতাদের লাভ-লোকসানের এই শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াইয়ের শহিদ হচ্ছে শিলিগুড়ি পুরসভা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাসহ এই বাণিজ্যিক শহরে নানা কাজের জন্য আগত মানুষ। কলকাতা যেমন শুধু কলকাতাবাসীদের জন্যই নয়, রাজ্যের রাজধানী কলকাতা সারা রাজ্যের মানুষের মহানগরী। তাই কলকাতাকে কল্লোলিনী নগরীতে রূপ দিতে রাজ্যের অর্থের এক বিপুল অংশ ব্যয় করলেও রাজ্যের মানুষের হিংসে হয় না, বরং সমর্থন জানায়। তেমনি উত্তরবাংলার অঘোষিত রাজধানী বলে ঘোষিত শিলিগুড়িকে উত্তরবাংলার সব জেলার মানুষই চায়, সে গঙ্গার এপারে একটা দ্বিতীয় কলকাতা হয়ে অন্যান্য রাজ্যের মতন এককেন্দ্রিক রাজ্য না হয়ে বহুকেন্দ্রিক এলাকায় বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে উঠুক।

স্বাধীনতার ৬৯ বছরের সিংহদরজায় উপনীত হয়েও শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গ অবহেলিত হয়ে চিহ্নিত হবার ক্ষোভের ক্ষতকে বুকে বয়ে চলেছে। প্রথম ২২ বছর কংগ্রেসের, পরবর্তী ৩৪ বছর নিরবচ্ছিন্ন বামফ্রন্টের এবং বর্তমানে ৭ বছর তৃণমূলের রাজত্ব। কংগ্রেস দায়িত্ব চাপাতে চেয়েছে ২০০ বছরের বিদেশি শাসনের কুফলকে। তৃণমূল দায়িত্ব চাপাচ্ছে ৩৪ বছরের বামফ্রন্টের শাসনের কুফলকে। কিন্তু তারা কী করেছে, তার হিসেব দিতে কেউ এগিয়ে আসছে না। কারণ তাদের হিসেবের খতিয়ানে একের বিরুদ্ধে ক্ষমতার চেয়ার দখলের প্রতিযোগিতার বিবরণ ছাড়া আর কিছুই যে নেই।

বর্তমানে মেয়র অশোক ভট্টাচার্য তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দল পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরসভাসহ অন্য সংস্থাগুলির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে বলে অভিযোগ করছেন। অশোকবাবু তো দীর্ঘ বৎসর পুর দপ্তরের মন্ত্রীও ছিলেন। একটু পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখুন, তাঁর বামফ্রন্টের রাজত্বে বিরোধী দল পরিচালিত পুরসভার প্রতি তাঁরাও একই আচরণ করেছেন। বামফ্রন্টের রাজত্বে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যখন কলকাতা কর্পোরেশনে বিরোধীরা ক্ষমতায় এসেছিল, তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সাংবাদিকদের বলেছিলেন, কলকাতায় অনেক কিছু করার পরিকল্পনা ছিল, তা এখন করা যাবে না। কেন? রাজ্য সরকার তো কোনও দলের হয়ে পরিকল্পনার কথা ভাববে না। তাঁর ভাবার কথা সেখানকার সংস্থার মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের জন্য সেই পরিকল্পনার কথা। সেটাই তো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় গণতন্ত্রের রীতি। তবে কলকাতা পুরসভা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজ্যের শাসনকালের বিরোধী দলের হাতে গেলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমন হুমকি দিয়ে তাঁর অসহযোগিতাকে জানিয়ে দেবেন কেন?

আজ মেয়র অশোক ভট্টাচার্য মহানন্দা চর দখল নিয়ে মহানন্দা পরিদর্শনে গিয়ে মহানন্দা বাঁচাতে এর কথা বলছেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বেই তো এই চর দখল নিয়ে শুরু হয়েছিল লক্ষ লক্ষ টাকার সিন্ডিকেট-রাজ। তখন এই সিন্ডিকেট-রাজের কর্তারা ছিলেন সব কমরেড। তৎকালীন বিরোধী তৃণমূল নেতা গৌতম দেবরা এই সিন্ডিকেট-রাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর ছিলেন। আজ ক্ষমতার আকাশের মেঘের রঙের পরিবর্তনের সঙ্গে সেই সিন্ডিকেট-রাজের কমরেডরা লাল পতাকাকে মহানন্দার চরের বালির নিচে পুঁতে দিয়ে তৃণমূলের জাতীয়তাবাদের সম্পদে রূপান্তরিত হয়ে অশোক-বাহিনী থেকে গৌতম-বাহিনীর মূল্যবান সেনানী রূপে বরণীয় হয়েছে।

শিলিগুড়ি যানজট নিয়ে বিরোধী দলের মেয়র অশোক ভট্টাচার্য তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তিনি তো ক্ষমতার সিংহাসনে ছিলেন ৩৪ বছর। হামশি চকে রেলের কাছ থেকে শিলিগুড়ির যানজট মুক্ত করার মহতী পরিকল্পনা হাজির করে রেলের জমিটি বলতে গেলে বিনামূল্যে পেয়েছিলেন। এখানে যদি সেই প্রতিশ্রুতিমতো আধুনিক গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা হত, তবে শিলিগুড়ির রাস্তায় দু'পাশ ধরে দাঁড় করিয়ে রাখতে বাধ্য হওয়া যানের মালিকরা পেত পার্কিং-এর জায়গা। শহরের যানজটের সমস্যা অনেকটা মেটানো যেত। কিন্তু তাঁরই রাজত্বে সেই পার্কিং করার জন্য জমিটি তুলে দিলেন পরিবেশ ও শহরের পরিবেশকে তোয়াক্কা না করে কোনও এক আগরওয়াল ও কোনও এক মিত্তালের হাতে প্রোমোটারি মৃগয়ায় বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সের জন্য। আজ তো রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান মন্ত্রী গৌতম দেব পরিশ্রমী মন্ত্রী বলে পরিচিত। তবু শিলিগুড়ি শহরের এই বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সটি বহু ক্ষেত্রেই বেআইনিভাবে তৈরি— এই অভিযোগ জোরালোভাবে উঠে এলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে কেন বাধা থাকবে— এই প্রশ্ন তো আসতেই পারে।

শিলিগুড়ির মানুষ সমস্যা দূরীকরণের ভাবনাগুলিকে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করে এভাবে রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার কদর্য কাদা ছোড়াছুড়ি দেখতে দেখতে ক্লান্ত। তাঁরা চান গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিবেশের সুষ্ঠু মান্যতার মাধ্যমে শহরের পুর পরিষেবা। আজ যে ক্ষমতায়, কাল সে বিরোধী চেয়ারে— এটাই তো গণতন্ত্রের জীবনের লক্ষণ। একে মান্যতা দিতে রাজনৈতিক নেতারা এগিয়ে আসুন। তা না হলে গণতন্ত্রের পতনে সবারই যে সমাধি ঘটবে।

সৌমেন নাগ

কোচবিহার উপনির্বাচন

ওয়াকওভার গেম তবু এত গুরুত্ব কেন?

সরকারি ও দলীয় স্তরে ক্ষমতা হারাবার ফিসফিস জল্পনায় যখন গেল গেল রব তুলেছে দলের বিরোধী গোষ্ঠী ও মিডিয়ার একাংশ, তখন ঘনিষ্ঠ শিক্ষক নেতা পার্থপ্রতিম রায়কে কোচবিহার লোকসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা অনেকেরই মতে 'মাস্টারস্ট্রোক এবং জেলার তৃণমূলি রাজনীতিতে তিনিই যে শেষ কথা তা আবার প্রমাণ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ'। কার্যত নিয়মরক্ষার লড়াই হলেও এই উপনির্বাচনকে পাখির চোখ করে ঝোড়ো ব্যাটিং খেলছে তৃণমূল। কোথাও ঢিলেমি নেই। প্রচারে, প্রসারে, প্রভাবে রাজ্যের শাসকদল যখন অনেকটাই এগিয়ে, বিশেষ করে যখন বিরোধীরা ছিন্নভিন্ন দিশাহীন অবস্থায়। গত বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কং সখ্যর ভরাডুবির পর আর সে পথে না গিয়ে, জোট রাজনীতির সামান্যতম সৌজন্য না দেখিয়ে এককভাবে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছেন বিমান বসুরা। রাগে-দুঃখে-অভিমানে কংগ্রেসও প্রার্থী দিয়ে এক টার্মের সম্পর্ক ছেদ করে যেন বিবাহবিচ্ছেদের মামলা ঠুকে দিয়েছে। যদিও প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক বিশ্বরঞ্জন সরকার মনে করেন, জোটের পথ এখনও বন্ধ হয়নি। যাঁরা সত্যিই বিজেপি-র মতো সাম্প্রদায়িক শক্তি ও তৃণমূলের মতো অশুভ শক্তির বিনাশ চান, তাঁরা ফের জোট তৈরি করবেন কংগ্রেসের মতো ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় দলের সঙ্গে। তবে সিপিএম শরিকদের চাপেই এ ধরনের আচরণ করতে বাধ্য হয়েছে বলে মনে করেন বিশুবাবু।

জোট তৈরি ও তা ভেঙে দেবার মতো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা বাম-কং তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে একেবারে দিশাহীন হয়ে পড়েছে এই মুহূর্তে। প্রবল শক্তির কাছে প্রতিপক্ষের রণকৌশল কী হবে তা-ই এখনও ঠিক করতে পারছে না বামেরা। জনবল, অর্থবল সব খুইয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে লড়াই যে কতটা কঠিন তা-ও হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্লক। এক সময়ের শক্ত ঘাঁটি দিনহাটাতে আস্তানাহীন দল। শাসকদলের দাপটে সিংহদুয়ার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নেতা-কর্মীর অভাবে সিংহগর্জন মিইয়ে এখন যেন সংশপ্তকের ভূমিকায় বামেদের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী নৃপেন্দ্রনাথ রায়। শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের সন্ত্রাসকে ইস্যু করে দলের দুর্দিনে প্রার্থী হয়ে পথে নেমেছেন প্রাক্তন এই বিধায়ক ও সাংসদ। যদিও অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হলে বামেদের জয় নিশ্চিত বলে আশা প্রকাশ করেছেন সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক তারিণী রায়।

অসময়ের উপনির্বাচনে সাধারণ মানুষের উৎসাহ নেই। তবু তারা অবাক হচ্ছেন ভোট নিয়ে তৃণমূল দলের 'অতিরিক্ত'

কোচবিহারবাসীর অভিমত, জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের প্রতি নিখাদ আনুগত্যের পুরস্কার পেয়েছেন তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায়। (নিচে) প্রয়াত সাংসদ রেণুকা সিন্হা।

লম্ফঝম্প দেখে। কোচবিহার লোকসভা উপনির্বাচন অনেকটাই জৌলুসহীন হলেও তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু যথেষ্ট সিরিয়াসভাবে নেমেছে এই ভোটে। প্রদেশ থেকে জেলা, জেলা থেকে ব্লক হয়ে অঞ্চল— সর্বত্র পার্থপ্রতিম রায়কে জেতাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বেশ একটা ঐক্যচিত্র, যা কিনা শুধুমাত্র ছবির ক্যাপশনের জন্য নয়, কার্যক্ষেত্রেও তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মতভেদ, কাঠি দেওয়া ইত্যাদি সব ভুলে গিয়ে প্রতিদিনের ছোট-বড় কর্মসূচিতে দলের সব গোষ্ঠীর নেতা-নেত্রীরা হাজির হচ্ছেন। যদিও তৃণমূল নেতা উদয়ন গুহর ভাষায় তাল-মিলের কিছুটা অভাব রয়েইছে। এই উপনির্বাচনকে তৃণমূল এতটাই প্রাধান্য দিয়েছে যে, ইতিমধ্যে দলের রাজ্য সভাপতি তথা জেলা পর্যবেক্ষক সুব্রত বক্সী দু'দুবার এসেছেন, বৈঠক করে গিয়েছেন জেলার নেতাদের সঙ্গে, জনসভায় কর্মী-সমর্থকদেরও জেতার বার্তা দিয়েছেন। গ্রেটার কোচবিহারের দাবিদারদের একটি অংশের ভোট ঘাসফুলে ফেলতে বংশীবদন বর্মনদের সমর্থন আদায় করে নিয়েছেন মুকুল রায়।

এই লোকসভা জেলার সাতটি বিধানসভা নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে ছ'টি তৃণমূলের দখলে থাকলেও বামেদের হাতে রয়েছে কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রটি, যেখানে বিশেষ সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে তৃণমূলের তরুণ নেতা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীকে। প্রশ্ন উঠছে, কেন এত তৎপরতা প্রায়-ওয়াকওভার এই গেমে? দলের পক্ষ থেকে ২০১৮-র পঞ্চায়েত, ২০১৯-এর লোকসভাকে টার্গেটের কথা বলা হচ্ছে। এই উপনির্বাচনের ফলাফলে রাজ্য-রাজনীতি বা সংসদে কোনওরকম হেরফের না হলেও, রাজ্যবাসীকে বার্তা দিয়ে ছুটন্ত দ্বৈরথের ভূমিকা নিয়েছে তৃণমূল। এই উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে মূল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে লড়াইয়ে নামার কথা ঘোষণা করেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাগজে-কলমে এই যুক্তি সর্বজনগ্রাহ্য হলেও, তৃণমূল দলের অন্দরে কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে অনেক কথা। কেউ বলছেন, দিদির কাছে বিশাল ব্যবধানে জয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে এই প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার ব্যাপারে রাজি করিয়েছেন সুব্রত বক্সী ও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ভোটের ফল প্রতিশ্রুতিমতো না হলে স্বাভাবিক ভাবেই নেত্রীর কাছে পাশ মার্ক পাওয়া কঠিন হবে। অতএব কোথাও কোনও ফাঁক রাখা চলবে না। অনেকের ধারণা, দীর্ঘদিন বাদে জেলার রাজনীতিতে প্রবীণ নেতা মিহির গোস্বামীর পুনরাবির্ভাব বহু নেতা-নেত্রীর পছন্দ হয়নি।কোচবিহার পুরসভা এলাকায় গত নির্বাচনে হাজার আটেক ভোটে পিছিয়ে ছিলেন মিহিরবাবু, যার কারণ হিসেবে অন্তর্ঘাতকে দায়ী করেন শহরের মানুষ। কিন্তু পুরসভার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত জনমত এবার সেই অন্তর্ঘাত না থাকলেও ব্যবধানকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে অভিজ্ঞ ও সচেতন একটি মহলের ধারণা, সংখ্যালঘু তোষণ, সীমান্ত এলাকায় বেড়ে চলা অনুপ্রবেশ-গোরুপাচার-নাশকতা ইত্যাদি শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়িয়ে তুলছে, গোয়েন্দা সূত্রে সে ইঙ্গিত মিলেছে বলেই কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না তৃণমূল দল।

কিন্তু নেতৃত্বের অভাব বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, সুযোগ থাকলেও অন্তত এই জেলায় তা কাজে লাগাতে পারছে না বিজেপি। ছিটমহল বিনিময় নরেন্দ্র মোদি সরকারের সাফল্যের চিহ্ন হিসেবে কোনও প্রচারই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেননি বিজেপি নেতা-কর্মীরা। বদলে বিজেপি পৃথক রাজ্যের দাবিতে সরব সংগঠন 'দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন'-এর নেতা অনন্ত রায়ের সঙ্গে আঁতাঁত করে ভোটে জেতার কৌশল নিয়েছে। বিজেপি-র এই কৌশলী পদক্ষেপের কারণে তাদের ট্র্যাডিশনাল ভোট কতটা ধরে রাখতে পারবে তা নিয়েও দেখা দিয়েছে সংশয়। জয় দূর অস্ত এই সত্য যেন মনেপ্রাণে মেনেই নিয়েছেন বিজেপি সমর্থকরা, তাদের মতে এই উপনির্বাচন আসলে রানার্স-আপ হওয়ার লড়াই। যদিও এ প্রসঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হেমচন্দ্র বর্মন বলেন, আমরা দ্বিতীয় হবার লড়াইয়ে নামিনি, কেন্দ্রে জয় আমাদের সময়ের অপেক্ষা।

ভোটের ইমেজ, গ্ল্যামার— কোনওটাই হয়ত নেই, তবুও কোচবিহার লোকসভা উপনির্বাচনে দ্বিতীয় হচ্ছেন কারা? এ নিয়ে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক চর্চা তুমুল। কারণ, একথা এখন কারওরই অজানা নয় যে, বাম ও কংগ্রেস সংগঠন সাইন বোর্ডে পরিণত হওয়ায় রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরিতে আর বিলম্ব নেই। আর এই উপনির্বাচন হবে তার প্রথম মাইলস্টোন।

রাজ্যের শাসকদল এখন এই জেলায় সুসংহত। তাবড় জেলা নেতাদের অনেকেই এখন সংযত। শাসকদলের নেতা-কর্মী হলেই যে ছাড় পাওয়া যায় না তা সাম্প্রতিক অতীতের কয়েকটি ঘটনা প্রমাণ করে। দলের ইমেজ রক্ষায় নেত্রী যে কোনও ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন— এই শঙ্কাও রয়েছে নেতা-নেত্রীদের। তাই বোধহয় আপাতত কোনও অন্তর্ঘাতের বা এলাকা দখলের প্রশ্ন নেই, যত বেশি সম্ভব মার্জিনে ভোট জেতার যে লক্ষ্য নিয়েছে তৃণমূল, তাতে এক সুরে গান ধরেছেন ছোট-বড়-মাঝারি মাপের সব জেলা নেতাই।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

লাটাগুড়িতে রেললাইনের উপর ফ্লাইওভার ! চলবে না ? মানব না ?

রেল দপ্তর ঠিক করেছে এনজেপি-মাল-চ্যাংরাবান্ধা রুটে বেশি পরিমাণে ট্রেন চালানো হবে। উদ্দেশ্য এক, জঙ্গলের পথে (মাল-বীরপাড়া-হাসিমারা রুটে) বন্য প্রাণ ট্রেনের ধাক্কায় হামেশাই মারা পড়ে, যা অবিলম্বে প্রতিহত করা দরকার। অতএব এই রুটে চলাচলকারী মালগাড়ি ও দূরপাল্লার ট্রেন বিকল্প রুটে চালাতে হবে। দুই, মাল-চ্যাংরাবান্ধা রুটে লোকাল ট্রেন বেশি চললে এইসব প্রত্যন্ত এলাকাতে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হবে। অতএব রেলের উদ্দেশ্য যে মহৎ তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

খুব স্বাভাবিকভাবেই যান চলাচল অব্যাহত রাখতে জাতীয় সড়কের পূর্ত দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে লাটাগুড়িতে বিছাভাঙা লেবেল ক্রসিং-এ ফ্লাইওভার তৈরির। আধুনিক গতিময়তার যুগে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির উপর বারবার লেবেল ক্রসিং বন্ধ করে রেল যাতায়াত অচিরেই সড়কপথে যাতায়াতকারীদের অসুবিধার সৃষ্টি করবে। ফ্লাইওভার হলে রাস্তা চওড়া হবে, অতএব কয়েকশো গাছ কাটা পড়বে ঠিক কথা। সেই সঙ্গে হাতিদের যাতায়াতের করিডর ব্যাহত হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিন্তু ভেবে দেখুন, এতে রেললাইনে ঘন ঘন বন্য প্রাণ মৃত্যু বন্ধ হবে, যা যে কোনও পরিবেশপ্রেমী তথা বন্য প্রাণপ্রেমীর কাছে অনেক বেশি কাম্য।

তোর্সার মতোই এবার মহানন্দায় নজর পড়ুক মুখ্যমন্ত্রীর

ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী জয়গাঁ এলাকায় তোর্সা নদীর ভাঙন প্রতিরোধ তথা পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ চোখে পড়বার মতোই। কারণ নির্বাচনের আগে এ নিয়ে তিনি একটি এক্সপার্ট কমিটি গঠন করেছিলেন, যার চেয়ারম্যান করা হয়েছিল জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান মিহির গোস্বামীকে। মিহিরবাবু তাঁর প্রাথমিক রিপোর্টটি খুব অল্প সময়েই সরকারকে জমা দেন। তারপর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোয় চেয়ারম্যান পদেই ইস্তফা দেন তিনি।

কিন্তু নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী ফের উদ্যোগ নেন তোর্সা ভাঙন ও পরিবেশ দূষণ রোধে। সেচ মন্ত্রীকে নির্দেশ দেন দ্রুত চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেবার জন্য। ফের চালু হল পুরনো এক্সপার্ট কমিটি, যার প্রথম বৈঠক ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিলেই সরকার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজকর্ম শুরু করবে।

সংবাদপত্রে এ খবর প্রকাশিত হওয়ার পর শিলিগুড়ির মানুষ চাইছেন, তাঁদের মহানন্দার করুণ অবস্থার অবসানে মুখ্যমন্ত্রী একই রকমভাবে উদ্যোগী হোন। ক্ষীণকায় মহানন্দার চর জুড়ে গড়ে ওঠা খাটাল, গাড়ি ধোয়ার গ্যারাজ, বর্জ্য নিষ্কাশন ইত্যাদি বহাল তবিয়তে চলছে বহু বছর ধরে। এই অব্যবস্থার শুরু হয়েছিল বাম-আমলেই, সরকার পরিবর্তন হলেও বহু প্রতিশ্রুতি

সত্ত্বেও পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। পূতিগন্ধময় মহানন্দা আজ শিলিগুড়ি শহরের কলঙ্ক হিসেবে সর্বজন-পরিচিতি লাভ করেছে।

সম্প্রতি মহানন্দার জলে কালো আস্তরণ মানুষের উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। পানীয় জলের সঙ্গে কোনওভাবে মিশে গেলে যা আজ হোক বা কাল মহামারীর আকার ধারণ করতে পারে। সাধারণ মানুষের আশঙ্কা, যা অমূলক প্রমাণিত হওয়ার কোনও উদ্যোগ বা ব্যবস্থাই নেই। মানুষ আজ বুঝে গিয়েছে, মহানন্দাকে সুস্থ স্রোতস্বিনী হিসেবে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আজ অশোক ভট্টাচার্য বা গৌতম দেব কারওই নেই। পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলিরও ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ বাইরের জগতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যম আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তাই শিলিগুড়ির সর্বস্তরের মানুষ মনে করেন, একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর কড়া হস্তক্ষেপই বাঁচাতে পারে মহানন্দা তথা শিলিগুড়ি জনপদকে। সেই দিনটির অপেক্ষাতেই বসে আছে শিলিগুড়ি।

চোরাশিকার রোধে বন দপ্তরের উদ্যোগ প্রশংসনীয়, যদিও তা একার কম্ম নয়

অক্টোবর মাসের প্রথম সাত দিন বন্য প্রাণ সপ্তাহ পালিত হয়। সে সময়ই রাজ্যের বন মন্ত্রীর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বন দপ্তরের অনমনীয় মনোভাবের কথা স্পষ্ট হয়েছিল 'এখন ডুয়ার্স' পত্রিকার পাতায়। সততা ও নিষ্ঠা থাকলে যে চোরাশিকার রোধ করা খুব কঠিন কাজ নয়— এ কথা সম্প্রতি আবার প্রমাণ করেছে বন দপ্তর। পুজোর পরপরই জলদাপাড়ার জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে ধরা হল চার চোরাশিকারি তথা পাচারকারীকে, তাদের সঙ্গে মিলল গন্ডারের খড়্গ ও এ কে ৪৭ রাইফেল। গন্ডার মারতে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল কতটা প্রয়োজন হয়, সে নিয়ে স্বাভাবিক সন্দেহ পুলিশকে সাহায্য করছে জঙ্গিদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ সূত্র খুঁজে বার করতে।

চোরাশিকারির সন্ধান মিলল বক্সা টাইগার রিজার্ভের আসাম সীমান্ত সংলগ্ন ভল্কা রেঞ্জের গভীর জঙ্গলেও। তারা পালিয়ে গেলেও পড়ে রইল তাদের বন্দুক-গুলি। বোঝা গেল, তারা দীর্ঘদিন ধরেই জঙ্গলের এই প্রত্যন্ত এলাকায় বন্য প্রাণ শিকার করে পগারপার হত।

বন দপ্তরের সঙ্গে যে সক্রিয় রয়েছে বিএসএফ বাহিনী, তার প্রমাণ মিলল এক পাচারকারীর কাছ থেকে বিরল প্রজাতির সোনালি তক্ষক উদ্ধার হওয়ার খবরে। পাচারকারীকে ধরা না গেলেও এটুকু জানা গিয়েছে, সেই বিরল তক্ষকের আন্তর্জাতিক বাজারে দাম নাকি ৭০ লক্ষ টাকা। এর থেকেই সহজে অনুমান করা যায়, রোজ কত লক্ষ-কোটি টাকা মূল্যের বন্য প্রাণ ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে আমাদের অজান্তেই।

চোরাশিকার দমনে ডগ স্কোয়াড চালু করা রাজ্য বন দপ্তরের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, কোনও সন্দেহ নেই। বিএসএফ-এর কাছ থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি জার্মান শেফার্ড প্রজাতির কুকুর গন্ধ শুঁকেই বাতলে দিতে পারবে চোরাশিকারির অস্তিত্ব বা চোরাই বন্য প্রাণের দেহাংশ। সাফল্য মিললে ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে কুকুরের সংখ্যা। বলাই বাহুল্য, এই উদ্যোগ বছর পাঁচেক আগে নিতে পারলে ডুয়ার্স তথা দেশ এতদিনে বাঁচাতে পারত কোটি কোটি টাকার বন্য প্রাণসম্পদ।

বন্য প্রাণ চোরাশিকার আটকাতে জলদাপাড়ায় সম্প্রতি একটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সবার আগে দায়িত্ব নিতে হবে বনবস্তির মানুষকে তথা পঞ্চায়েত সদস্যদের। চোরাশিকারিদের আনাগোনা সবার আগে টের পাবেন তাঁরাই। আর জনপ্রতিনিধিরা যদি জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন, তবেই এ কাজে সাফল্য সম্ভব। সাধারণ মানুষের বক্তব্য যদিও অন্যরকম, আজকাল পঞ্চায়েত প্রধানরা সব ব্যস্ত থাকেন 'কামাই-ধান্দা'য়। সরকারি ভাতা, নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি যেখানেই টু-পাইস মিলতে পারে, সেখানেই তাঁদের আনাগোনা বা তৎপরতা বেশি। চোরাশিকারি খেদানোয় তো রোজগারপাতির প্রশ্ন নেই— অতএব ঘরের খেয়ে বনের চোর তাড়ানোয় তাঁরা আদৌ উৎসাহিত হবেন কি? এসব শুনে তাঁদেরও সাফ জবাব, 'পার্টির কাজে খোদ বন মন্ত্রীই যদি সময় না পান বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার, আমরা তো চুনোপুটি। যারা মূলস্তরে কাজকর্ম করি, তারা মানুষ ছেড়ে রক্ষার জন্য সময় কীভাবে বার করব বলেন তো দাদা?'

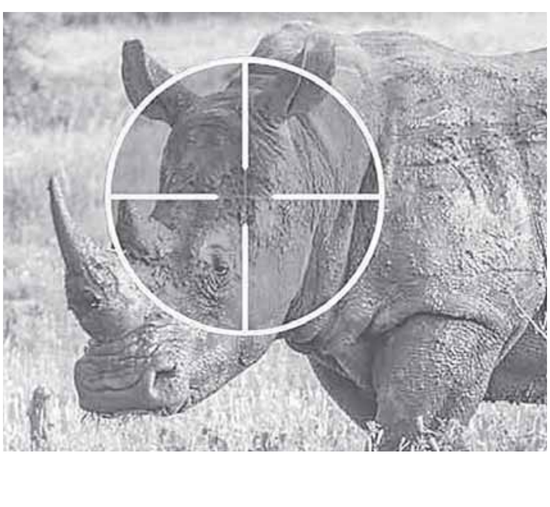

তিস্তার পাড়ে জাতীয় সড়কে বারবার ধস: কর্মফলের সূচনা?

বিষয় তিস্তায় ভাঙন। সেবক ব্রিজ থেকে তিস্তা বাজার ২৮ কিমি জাতীয় সড়কে ক্রমাগত ভাঙন ভ্রূ কুঁচকে দিয়েছে পূর্ত দপ্তরের— তাঁরা দোষারোপ করছেন এনএইচপিসি-কে, দু'-দু'টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জেরেই এই ধস। সিকিমেও নাকি একই কাণ্ড ঘটছে। ব্যারেজ থেকে ছাড়া জল প্রবল গতিতে দু'পাশে ধাক্কা মারছে, ফলে আলগা হয়ে যাচ্ছে মাটি। এরকমই যুক্তি দিচ্ছেন পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররাও। এনএইচপিসি অবশ্য পালটা দোষারোপ করছে পূর্ত দপ্তরকেই। তাদের যুক্তি, পাহাড়ে এবার প্রবল বৃষ্টিতে যে জল জমা হয়েছিল, তার নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকঠাক না থাকার ফলেই মাটি আলগা হয়ে ধসের সৃষ্টি হচ্ছে।

কার যুক্তি ঠিক তা নির্ধারণ করতে বেসরকারি সংস্থাকে সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। যার কথাই ঠিক হোক না কেন, আসল সত্যিটা হল, তিস্তার দু'ধারে ধসের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। প্রকৃতির খেয়ালে প্রতিবারই বৃষ্টি কম বা বেশি হয়, কিন্তু এবার যেভাবে ধস নেমেছে তা আগে খুব কমই দেখা গিয়েছে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ নদীর গতিপথে যে নানারকম ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন আনে, বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত। অনেক আগে থেকেই পরিবেশবিদরাও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করে আসছিলেন। এ নিয়ে আন্দোলন, কাগজে লেখালেখি, উপরমহলে চিঠিচাপাটিও কম হয়নি। সিকিমকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে বারবার। তিস্তার পাড় জুড়ে এই ঘন ঘন ভাঙনে দায়ী কারা— এ নিয়ে যে বিতর্কের সূচনা হয়েছে তা চলতেই থাকবে। কিন্তু যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সূচনা হতে যাচ্ছে বলে অনুমান করছেন অনেকেই, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে কি? স্রোতস্বিনীর গতি নিয়ন্ত্রণ করলে তার সুদূর পরিণাম আমরা অন্যত্র প্রত্যক্ষ করলেও, নিজেদের ঘরের কাছে তিস্তা নিয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বেগের অবকাশ কি মিলবে আদৌ?

উত্তরবঙ্গ বইমেলায়
‘এখন ডুয়ার্স’-এর স্টলে থাকছে যে সব বই

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর ২০১৬ থেকে

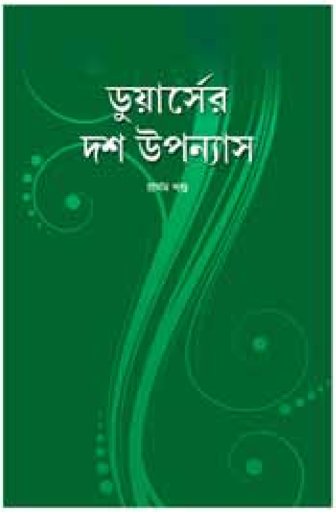

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস
মূল্য ২৫০ টাকা।

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা
মূল্য ৫০০ টাকা

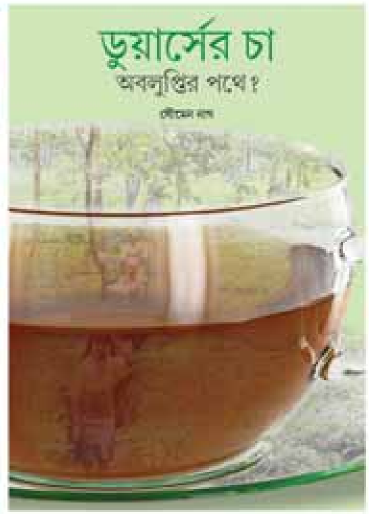

ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে?
সৌমেন নাগ। মূল্য ১৫০ টাকা

বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে তিনটি নতুন বই

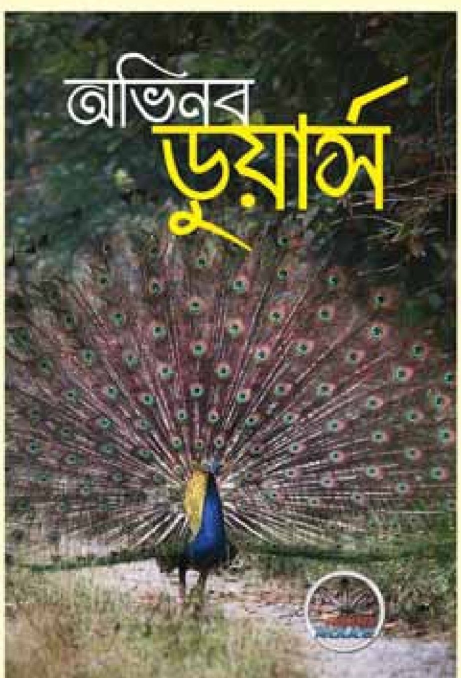

অভিনব ডুয়ার্স। মূল্য ২০০ টাকা

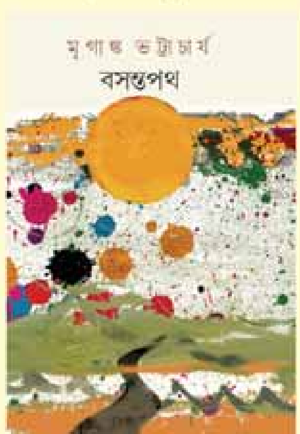

বসন্তপথ।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর উপন্যাস
মূল্য ১০০ টাকা

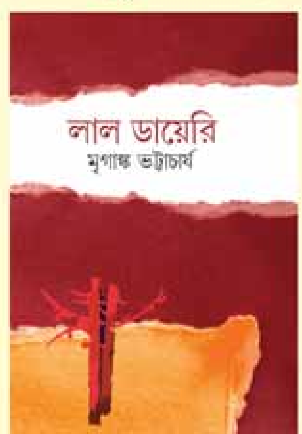

লাল ডায়েরি।
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর গল্প সংকলন
মূল্য ১৫০ টাকা

সবকটি বইয়ের ডুয়ার্সে প্রাপ্তিস্থান
আড্ডাঘর। মুক্তা ভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি

শতবর্ষে ইন্দিরা স্মরণ

তৃতীয় বিশ্বের নেতা ভারত আজ সঙ্গীহীন

একটা হতাশার পরিবেশে কংগ্রেসের ঝান্ডা হাতে নিয়েছিলাম। কারণ তখন আদর্শের টানে কেউ কংগ্রেস করছে— এটা বিশ্বাস করানো কঠিন ছিল। তাই কেবল ভাবতাম, কবে এই বন্ধুবান্ধবদের ভিতর প্রচলিত ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারব যে, চাকরি নয়, ভাল কোনও ব্যবসার পারমিট নয়, কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ের যে লেগাসি, 'বহুদের মাঝে মিলন মহান' করে রাখার যে ঐতিহাসিক কৃতিত্ব, তার টানেই কংগ্রেসে আসা। আমার বাবা ছিলেন এম এন রায়ের অনুগামী, র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট, মা ছিলেন নেতাজির অন্ধ-ভক্ত। সেই অর্থে আমি কংগ্রেস ঘরানার লোক নই। তাই আমার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত একান্তই আমার নিজস্ব ছিল। সে দিন রাজ্য জুড়ে যে শাসকদল বিরোধী হাওয়া, তার পরিণতি কী হতে পারে তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না।

তাই কখনওই ভাবিনি যে, '৬৭ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে। কারণ '৬৬-র খাদ্য আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের পরিণতিতে পুলিশের গুলিতে নুরুল, আনন্দ, রঞ্জনের মৃত্যুই বলে দিয়েছিল কী হতে চলেছে। তাই যা হওয়ার তা-ই হল। রাজ্যে অকংগ্রেসি সরকার ক্ষমতায় এল। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো অজয় মুখার্জিকে দল থেকে বিতাড়িত করে বাংলা কংগ্রেসের জন্য পরিসর তৈরি করে দিয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যে এই কাজটি আরও নিশ্চিত করে দিলেন। ন'টি রাজ্যে অকংগ্রেসি সরকার আর কেন্দ্রে কোনওভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারটা ফিরে এল। বার্তাটা ইন্দিরাজি পড়তে পেরেছিলেন। কত দূর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন বা কত দূর ডিগ্রি নেওয়ার প্রচেষ্টায় থেকেছেন তা তাঁর কাছে প্রাসঙ্গিক ছিল না, কারণ দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ 'দার্শনিক-রাজনীতিবিদ' ছিলেন তাঁর পিতা। তাঁর পত্রাবলি ও ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ইন্দিরাজিকে যে প্রজ্ঞা দিতে সক্ষম হয়েছিল, তার প্রয়োগ করেই তিনি 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য' হতে পেরেছিলেন, এবং দেশের মানুষের 'মা' হয়ে বন্দিত হয়েছিলেন। দু'বছর অপেক্ষা করে '৬৯-এ ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনে তাই দূরদর্শিতার নজির স্থাপন করে বলতে পেরেছিলেন, "Time will not wait for us, millions of people who demand job, food and shelter are pressing for action." অ্যাকশন শুরু হল। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হল, রাজন্যভাতা বিলোপ হল, কয়লাখনি জাতীয়করণ হল। এবং পরবর্তীতে বিদেশি তেল কোম্পানিগুলিরও জাতীয়করণ হল।

'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' কংগ্রেসের আদর্শ, '৬৪-তে ভুবনেশ্বর কংগ্রেস অধিবেশনে নেহরুজি ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তার প্রয়োগ করেছিলেন ইন্দিরাজি। দলের ভিতর থেকে প্রতিরোধ ছিল। তাই স্বল্প পরেই তথাকথিত সিন্ডিকেট (মোরারজি, এস কে পাটিল, অতুল্য ঘোষ প্রমুখ) রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে দলের ভিতর শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ইন্দিরাজির মতের বিরুদ্ধে নীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে প্রার্থী করে ওঁর উপর চাপিয়ে দিল। ইন্দিরাজি জানতেন, দল হয়ত একশো শতাংশ তাঁর সঙ্গে নেই, কিন্তু দেশ তাঁর সঙ্গে আছে। তাই বিবেকের ভোটের আহ্বান জানিয়ে ভি ভি গিরিকে তিনি যখন প্রার্থী ঘোষণা করলেন, তখন লোকসভার সমস্ত প্রগতিশীল অংশ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রার্থীকে জয়ী করে দেশের মানুষকে একটা বার্তা দিলেন, যারা ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে ঘোরাতে চায়, দেশ তাদের বর্জন করে। আমরা যেন একটা দিশা পেলাম। দল যে কথাগুলি সময়ে সময়ে এক-একটা অধিবেশনে প্রস্তাব আকারে শুধু বলে গিয়েছে, ইন্দিরাজি তা একের পর এক বাস্তবায়িত করে, কংগ্রেসের পুরনো পরম্পরাকে ফিরিয়ে আনলেন— মানুষকে বাদ দিয়ে দল নয়, মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দলের ভিতর যদি না থাকে তাহলে দল মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। মানুষ চেয়েছিল বলেই কংগ্রেস 'হোমরুল' চেয়েছিল, মানুষ চেয়েছিল বলেই কংগ্রেস 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' চেয়েছিল, মানুষ চেয়েছিল বলেই 'পূর্ণ স্বরাজ' চেয়েছিল, আর মানুষ চেয়েছিল বলেই অহিংসার পূজারি গান্ধিজিকে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' বলতে হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে, তমলুক, সাতারা, বালিয়াতে বিকল্প সরকার গড়তে হিংসার আশ্রয় নিতে কংগ্রেস পিছপা হয়নি।

সেই মানুষ কী চাইছে, সবচেয়ে ভাল ইন্দিরাজি বুঝতেন বলেই '৬৯-এ দলের অচলায়তনকে ভেঙে নতুন চেহারায় দলকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে, একের পর এক প্রগতিশীল কর্মসূচির ভিতর দিয়ে '৬৭-র হারিয়ে যাওয়া আস্থা পুনরুদ্ধার করতে শুরু করলেন। বিভাজনের ফলশ্রুতিতে লোকসভায় তিনি সংখ্যালঘু। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহস হয়নি অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাঁর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবার চেষ্টা করতে। '৭১-এর নির্বাচন এল। বিরোধীদের স্লোগান উঠল, 'ইন্দিরা হঠাও।' ইন্দিরাজি স্লোগান দিলেন, 'গরিবি হঠাও।' ৩৫৪ জন সদস্য নিয়ে লোকসভায় ফিরে এলেন। অব্যবহিত পরেই পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হল স্বাধীনতার যুদ্ধ। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে দূরদর্শী ইন্দিরাজি একদিকে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন, অন্য দিকে পৃথিবীর দেশগুলিকে, বিশেষ করে শক্তিধর দেশগুলিকে বোঝাবার কাজ শুরু করলেন, পূর্ব পাকিস্তানে যে 'জেনোসাইড' চলছে তা মানবতাবিরোধী এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে এই নরসংহার থেকে বিরত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ

লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। চট্টগ্রাম, বরিশালে বাঘা সিদ্দিকীরা লড়াই করেছেন, কিন্তু রাজশাহি, পাবনা, বগুরা, রংপুর— আমরা জানি, অসামরিক পোশাকে যদি বিএসএফ মুক্তিবাহিনীর ভূমিকা পালন না করত তাহলে বাংলাদেশ হয়ত অন্য কোনও ইতিহাস লিখত। জানতেন, আমেরিকাকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ’৭১-এর অগাস্ট মাসে রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি করে একটা সুপারপাওয়ারকে সঙ্গে রাখা নিশ্চিত করলেন।

জানি না, এটা কাকতলীয় কি না, ৪ ডিসেম্বর ইন্দিরাজি কলকাতায় ব্রিগেডে সভা করছেন, আর পাকিস্তানি বায়ু সেনা কলাইকুন্ডায় বোমা বর্ষণ করল। ব্রিগেড থেকেই ইন্দিরাজি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মাত্র দশ দিন। ছিয়াশি হাজার সেনা নিয়ে নিয়াজি আত্মসমর্পণ করলেন। নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল। ইতিহাসে এই নজির বোধহয় আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না, একটা দেশ স্বাধীন করে দিয়ে ঘোষিত সময়সীমার ভিতর শেষ ভারতীয় সেনাটিও বাংলাদেশের মাটি ছেড়ে চলে এল।

’৬৬-এর খাদ্য আন্দোলন থেকে খাদ্যসুরক্ষা প্রকল্প— অনেক পথ হাঁটতে হয়েছে দেশকে। পিএল ৪৮০-তে যে গম আনতে আমেরিকার কাছে মাথা নিচু করতে হত, সেখান থেকে দেশকে ইন্দিরাজিই রেহাই দিয়েছিলেন।

হয়ত নেহরুজির মতো আন্তর্জাতিক তিনি হতে পারেননি। কিন্তু তিনিই প্রথম স্লোগান তুললেন যে, পৃথিবীতে 'New International Economic Order' মেনে সবাইকে চলতে হবে। সাম্যই হবে বৈদেশিক সাহায্যের ভিত্তি। প্রকৃতি কোনও দেশকে অনেক দিয়েছে, কোনও দেশকে দিতে কার্পণ্য করেছে, তার অর্থ এই নয়, যার কম আছে, তাকে যার বেশি আছে, তার কাছে মাথা বিক্রি করে সাহায্য চাইতে হবে। প্রকৃতির দানের উপর গোটা পৃথিবীর মানুষের সমান অধিকার আছে। এর উপর ভিত্তি করেই তিনি ‘নর্থ সাউথ ডায়ালগ’ শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে এই তত্ত্বই জোটনিরপেক্ষ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই দেশের বাইরে, দেশের ভিতরে— কোথাও তিনি থেমে থাকেননি। সামন্ততান্ত্রিক ভারতে মূল শোষণ যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ভূমিহীন, খেতমজুর ও প্রান্তিক চাষিদের বঞ্চনার শিকার করে রেখেছিল, সেখানে তিনি আঘাত করেছিলেন শোষণের বিরুদ্ধে, শোষককে। তাই তাঁর বিশ দফা কর্মসূচিতে ভূমিহীনকে জমির অধিকার, গৃহহীনকে বাসস্থানের অধিকার, কর্মহীনকে রোজগারের অধিকার, ঋণগ্রস্ত মানুষকে মহাজনি শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকার দিয়ে জাতপাতের ভারতবর্ষে, ধর্মের ধ্বজা তুলে বিভাজনের রাজনীতির ভারতবর্ষে মানুষকে একটা বিকল্প পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন— তুমি হরিজন নও, তুমি গরিব; তুমি আদিবাসী নও, তুমি গরিব; তুমি তপশিলি নও, তুমি গরিব; তুমি হিন্দু নও, তুমি গরিব; তুমি মুসলমান নও, তুমি গরিব। তোমার লড়াই মসজিদ ভাঙার নয়— তোমার লড়াই শোষণের শৃঙ্খল ছেঁড়ার।

জরুরি অবস্থা, জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন— তা নিয়ে লিখতে বসিনি। আজ নতুন করে লেখবার প্রয়োজন নেই, কেন জরুরি অবস্থা হয়েছিল। আজ নতুন করে বলবার দরকার নেই, জয়প্রকাশের আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল। সে দিন সিপিআই-ই বলেছে, এই আন্দোলন

ফ্যাসিবাদী আন্দোলন। এই প্রতিক্রিয়ার বাতাবরণে কি বলতে পারি দুই উগ্রপন্থী শিখ নয়, যে শক্তি বাংলাদেশে মুজিবকে হত্যা করেছে, সিংহলে সিরিমাভো বন্দরনায়েককে ক্ষমতাচ্যুত করেছে, পাকিস্তানে ভুট্টোকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়েছে, সেই শক্তিরই বলি হয়েছিলেন ইন্দিরাজি ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর?

১৯ নভেম্বর থেকে ইন্দিরাজির শতবার্ষিকী পালিত হবে দেশ জুড়ে। কাকতালীয়ভাবে হত্যার ক’দিন আগেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, ডাক্তাররা ইন্দিরাজির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন, তাঁর বয়সে যে প্রোফাইল পাওয়া গিয়েছে তা অবিশ্বাস্য। অর্থাৎ আরও বহুদিন বেঁচে থাকবার জীবনীশক্তি ছিল তাঁর। দেশের অভিধান থেকে ‘দারিদ্র’ শব্দটাকে মুছে দিতে চেয়েছিলেন, তাই সামন্ততান্ত্রিক দেশে তাঁকে সময় হওয়ার আগেই চলে যেতে হল।

আকাশের তারাদের যেমন গোনা যায় না, সমুদ্রের গভীরতা যেমন মাপা যায় না, মহাকাশের সীমানা যেমন খোঁজা যায় না, স্বল্প পরিসরে ইন্দিরাজিরও মূল্যায়ন করা যায় না। আমি কোথাও কোথাও কোনও কোনও লেখাতে ইন্দিরাজিকে নিয়ে দু’-এক কলম লিখেছি, তাই এই লেখাতেও তার কোনও কোনও প্রতিফলন ঘটতে পারে। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে গিয়ে বলেছিলাম, তাঁর পতাকা বহন করবার শক্তি অর্জনের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা এ দেশের উপর অর্পিত হয়েছে। কারণ, এ দেশ শুধু নিজের স্বাধীনতার যুদ্ধ করেনি, বিংশ শতাব্দীতে মুক্তিকামী দেশগুলির পাশে সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই নামিবিয়া স্বাধীন হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন হয়েছে, প্যালেস্টাইন তার মাতৃভূমিতে পা রাখার সুযোগ পেয়েছে। ইন্দিরাজির নেতৃত্বে ভারত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে সুদৃঢ় করে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে একত্রিত করে পৃথিবীর তৎকালীন দুই শক্তিধর দেশকে বলতে পেরেছিল, ‘তোমরাই শেষ কথা বলবে না, আমাদের কণ্ঠস্বরও শুনতে হবে।’

পথ দেখিয়েছিলেন পণ্ডিত নেহরু, আর সে পথে অটল ছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। ’৭৪-এ পোখরান বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, নন-প্রলিফারেশন ট্রিটিতে স্বাক্ষর না করে ইন্দিরাজি শুধু দেশের মাথা উঁচু করেননি, তৃতীয় বিশ্বের শতাধিক ছোট দেশকে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন।

আজ ইন্দিরা গান্ধি নেই, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন শুধু স্তিমিত হয়ে গিয়েছে তা-ই নয়, ভারত সে পথকে পরিত্যাগ করবার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাই গোয়ার ব্রিক্স সম্মেলনে ওবামার প্রতি অতিশয় আতিশয্য দেখিয়ে পুরনো বন্ধু পুতিনের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক আঙিনায় ভারতের পরিচয় ছিল তৃতীয় বিশ্বের নেতা হিসেবে। কারণ জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি নেহরু, ইন্দিরাকে অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে বিভিন্ন সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সহমর্মিতা জানাতে কার্পণ্য করেনি। আজ তারা পাশে নেই, কারণ আজ ইন্দিরা গান্ধি নেই। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এক অর্থে ছিল গান্ধিবাদের আন্তর্জাতিকীকরণ। তাই দেশে ইন্দিরাজির প্রয়াণে ভারত কেবল একজন নেত্রীকে হারায়নি, আন্তর্জাতিক আঙিনায় এ দেশ প্রদর্শিত গান্ধিবাদেরও অবলুপ্তি হতে দেখছে। পোখরান বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেও যে দেশ আন্তর্জাতিক স্তরে ভারসাম্যের রাজনীতিতে কখনও একাকিত্ব বোধ করেনি, আজ সেই দেশ সঙ্গীহীন হয়ে উরিতে, পাঠানকোটে অথবা কখনও অগ্নিগর্ভ কাশ্মীরে সমাধানের পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

দেবপ্রসাদ রায়

টিলাবাড়ির টিলায় টুরিস্টদের নতুন ঠিকানা

যেখানে নিস্তব্ধতা, যেখানে নীরবতা, যেখানে নিবিড় নিসর্গের নিংড়ে দেওয়া বিস্তীর্ণ সৌন্দর্য, যেখানে খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর খেয়ালি প্রবাহ, যেখানে গা ছমছম করা বন, বনাঞ্চল আর বন্য প্রাণীর সতত পদচারণা, যেখানে রাতের অন্ধকারে ভেসে আসে ধামসা মাদলের সুর, সেরকম স্থানই তো যে কোনও পর্যটক বা প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের প্রথম পছন্দের স্থান। গত পূজা মরশুমে (৩০ সেপ্টেম্বর) এরকম একটি বর্ণময় পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলার মাটিয়ালি ব্লকের টিলাবাড়িতে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে টিলাবাড়ি টুরিস্ট কমপ্লেক্সের। চালসা থেকে লাটাগুড়ি বা ময়নাগুড়ি আসার জাতীয় সড়কপথে ৮ কিলোমিটার পেরলেই পৌঁছে যাওয়া যায় জাতীয় সড়কের পাশেই অবস্থিত টিলাবাড়ির এই স্বর্গোদ্যানে। আবার অপর দিকে ময়নাগুড়ি থেকে জাতীয় সড়ক হয়ে লাটাগুড়ি ও তারপরে গোরুমারা জাতীয় উদ্যান পার করে ১ কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই পৌঁছে যাওয়া যায় টিলাবাড়িতে।

এখানে বাতাসের বুনো গন্ধ মানুষকে স্বপ্নিল করে তোলে। প্রকৃতি এানে উজাড় করে মেলে ধরেছে তার বর্ণময় রূপ, রং, রস, গন্ধ আর অনাবিল সৌন্দর্য। দু'চোখের সামনে শুধুই সবুজ দিগন্ত। আর এই দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মানুষের চোখে ও হৃদয়ে এঁকে দেয় সবুজের স্বপ্ন। এখানে স্বপ্নের রংও সবুজ। এখানে ভাললাগার ও ভালবাসার সুরে সুরে ঝংকৃত হয় দিগন্তবিস্তৃত সবুজের গান।

বাতাবাড়ি চা-বাগানের টিলাবাড়ি ডিভিশন সংলগ্ন এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত উঁচু একটি টিলা। নানারকম গাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই টিলাটির উপরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের উদ্যোগে নির্মিত হয়েছে এই টুরিস্ট কমপ্লেক্সটি। এখান থেকেই সকালের সূর্যোদয়ের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। স্নিগ্ধ দুপুরে পুবালি বাতাস খেলা করে সংলগ্ন বন-বনানীর শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়। পড়ন্ত বিকেলে টম্যাটো রঙের রোদ ছড়িয়ে পড়ে চা-বাগান, বন-বনানীর খোপে খোপে আর সবুজ দিগন্তে। তারপর দীর্ঘ হতে থাকে ছায়া। ধীরে ধীরে নিবে যায় সূর্যের আলো। দিনান্তে নেমে আসে সন্ধ্যা। ঝাঁকে ঝাঁকে ময়না-টিয়াসহ নানা প্রজাতির পাখপাখালি টুরিস্ট লজের মাথার উপর দিয়ে ফিরে যায় আপন কুলায়। যেতে যেতে কিচিরমিচির বোলে ঘোষণা করে যায়

টিলাবাড়ি টুরিস্ট কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন করলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব।

দিনাবসানের বার্তা। সন্ধ্যা নামতেই সংলগ্ন চা-বাগানের আদিবাসী লাইন থেকে ভেসে আসে ধামসা মাদলের সুর।

রাতের অন্ধকার যত গভীর হতে থাকে, সমগ্র বনাঞ্চল জুড়ে নিস্তব্ধতার মাঝে ঝিঁঝিপোকার ডাক এক অভিনব সুরঝংকারের সৃষ্টি করে। জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা শত শত জোনাকি সাজিয়ে তোলে এক দৃষ্টিনন্দন আলোকমালা। তারপর ধীরে ধীরে এক হৃদয়ভরা অনুভূতির মধ্যে দিয়ে টুরিস্ট কমপ্লেক্সটিকে অন্ধকারে মুড়ে ফেলে নেমে আসে শীতল রাত্রি। শিকারের সন্ধানে টুরিস্ট কমপ্লেক্সের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ায় রাতচরা বিহঙ্গের দল। দূরের জঙ্গল থেকে ভেসে আসে ময়ূরের কেকা। আশ্চর্য নীরবতা ও নিস্তব্ধতায় আরও গভীর হতে থাকে রাতের অন্ধকার। মাঝে এই নিস্তব্ধতা ভেদ করে পাশের জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে ছুটে চলে যায় কোনও গাড়ি। দূর থেকে ভেসে আসে খরস্রোতা মূর্তি নদীর জলকল্লোলের সুরধ্বনি। এখানে টুরিস্ট কমপ্লেক্সে বসেই দেখা যায় বুনো হাতির সতত পদচারণা। তা ছাড়া দেখা যায় বাইসন, চিতা বাঘ, খরগোশ, বন্য বরাহসহ বিভিন্ন বন্য প্রাণী। এ ছাড়া দেখা যায় পাহাড়ি ময়না, টিয়া, ধনেশ, রাজশকুন, বুনো কবুতর, ময়ূর, বুনো মুরগি প্রভৃতি। গোরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এই এলাকাটি বুনো হাতির

যাতায়াতের করিডর হিসেবে পরিচিত।

এখান থেকে পর্যটকরা গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের সব ক'টি ওয়াচটাওয়ারে গিয়ে বন্য প্রাণী দেখতে পারেন। তা ছাড়া মূর্তি নদীতে পোষা হাতির স্নানের দৃশ্যও উপভোগ করতে পারেন। গোরুমারা জাতীয় উদ্যানসহ কাছাকাছি পর্যটকদের বিভিন্ন টুরিস্ট স্পটে নিয়ে যাওয়ার সুবন্দোবস্ত কর্তৃপক্ষ করে দিতে পারেন। খুব শীঘ্রই এখানে একটি আন্তর্জাতিকমানের সংগ্রহশালা খোলা হচ্ছে। পর্যটকদের সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার কথা ভেবে এখানে ১০টি বিলাসবহুল ও বাতানুকূল সুদৃশ্য কটেজ তৈরি করা হয়েছে। একসঙ্গে তিরিশজন পর্যটকের এখানে রাত্রিবাসের সুব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে পছন্দমতো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও। জীবনের একঘেয়েমি থেকে একটু দূরে একটু আলাদা হয়ে আলাদাভাবে টিলাবাড়ির এই পর্যটক আবাসে এক শান্ত ও অনাবিল নৈসর্গিক পরিবেশে আসুন, প্রাণ খুলে শ্বাসগ্রহণ আর মন খুলে কথা বলার ফাঁকে বসে বসে দেখুন বুনো হাতির খেয়ালি বিচরণ।

পরাণ গোপ

অন লাইন বুকিংয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের ওয়েবসাইটে যেতে হবে। কিংবা যোগাযোগ করুন পর্যটন দপ্তরের অনুমোদিত বুকিং এজেন্টদের সঙ্গে। শিলিগুড়ির একজন বুকিং এজেন্ট ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬।

গেরস্থের দাবি

বাড়ির সীমানা লাগোয়া পাশের স্কুলের শৌচাগার। যখন-তখন গন্ধাস্ত্রের আক্রমণে গেরস্থ কাহিল। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে হেডমিস্ট্রেসকে ডেকে ভয়ানক বাক্যবাণ নিক্ষেপ করার পর পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অবিলম্বে শৌচাগার যেন ট্রাকে করে তুলে অন্য কোথাও বসিয়ে দেওয়া হয়। ফলে হেডমিস্ট্রেসের চোখে সরষে। শৌচাগার তুলে নিয়ে পুনঃস্থাপনের খচ্চা দেবে কে? স্বচ্ছ ভারত মিশনে এমন অপশন তো নেই রে বাপ! বাঁটুল থাকলে না

হয় ঠেলেই সরিয়ে দিত। কিন্তু গেরস্থ অনড়-অটল-অচল। এর পর তুমুল হট্টগোল, প্রায় লাগে লাগে অবস্থা। শেষে গুরুজনদের হস্তক্ষেপে নাকি সাময়িক শান্তিকল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু গেরস্থ মূল দাবি থেকে নড়ছেন না। খানিকটা সময় দেওয়া যেতে পারে, তবে টয়লেটকে ট্রাকে তুলে ট্রান্সফার করতেই হবে। ঘটনাস্থল মালদা।

পট্যাভিযান

সাতসকালে জোড়া শালিক দেখবার পরই কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের রামপুরহাট গ্রামের বাসিন্দারা জেলাশাসকের মুখদর্শন করে ফেললেন। জানা যাচ্ছে যে, উনি নাকি 'বিশেষ উদ্দেশ্যে' কাকভোরে গ্রামে হাজির হয়েছিলেন চুপিচুপি। উনি কি প্রাতঃভ্রমণে এসেছিলেন? রামপুরহাটের বাতাসে কি উষালগ্নে অম্লজান বেশি থাকে? না রে মামা! উনি এসেছিলেন পটি ধরতে। মানে, যারা যারা মাঠে পটি করতে আসছে, তাদের ধরতে। এমনিতে রামপুরহাট জাতীয় গ্রামে জেলাশাসকের আগমন মরুভূমে বারিপতনের ন্যায় নিয়মিত। 'নির্মল বাংলা মিশন'-এর দৌলতে অবশেষে তিনি এসেছিলেন। কিন্তু মামা! সক্কাল সক্কাল পট্যাসনে বসে জেলাশাসক দেখে ঘেবড়ে গিয়ে যাদের পটি সে দিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল, তাদের জন্য দু'-একখানা শোক-মোমবাতি জ্বালবেন না?

জমিঠাঁই

এক যে ছিল পানিট্যাংকি চা-বাগান। তার ছিল সরকারের কাছ থেকে লিজ নেওয়া বিঘে পনেরো জমি। শিলিগুড়ির মতো জায়গায় জমি মানে কড়া পাকের জব্বর মিঠাই। পেলেই খেয়ে নিতে ইচ্ছে করে। তা লিজের জমি নিজের করে খেয়েও যাচ্ছিলেন কেউ কেউ। সিন্ডিকেটের পিণ্ডিদার সংখ্যা তো আর কম নয়। ঝপাঝপ জমিতে বাজার বসিয়ে দিচ্ছিলেন দাদারা! তেনাদের কীর্তির অবশ্যি শেষ নেই। এ বাগানের বিশ বিঘে, ও বাগানের ত্রিশ বিঘে হাতিয়ে সিন্ডিকেট ইন্ডাস্ট্রি শেয়ার তুঙ্গে তুলে দিচ্ছেন হেলা ভরে। হবে না-ই বা কেন? সিন্ডিকেটে যে সর্বদলীয় দাদারা কোঅপারেটিভ বানিয়েছেন। তা পাপের পাত্র ভরে যাচ্ছে দেখে অগত্যা মিডিয়ার তিরস্কারে প্রশাসন মুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে। ফিতে নিয়ে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নিচ্ছে জমি। কিন্তু মামা! এদ্দিন কীভাবে এসব হচ্ছিল, সেটা দু'কথায় বুঝিয়ে দেবেন কি? এত এত জমিঠাঁই চুরি! প্রশাসনে বসে তোমরা Zানতি পারোনি?

ডেঙ্গি হওয়া আলো

পদমতি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিদ্যুৎ আছে। বিদ্যুৎ দিয়ে আলো জ্বালানোও যায়। কিন্তু কর্তা! আলো বোধহয় আর বেশি দিন জ্বলবে না! এলাকার ট্রান্সফর্মারটা যেভাবে ফর্ম হারাচ্ছে দিন দিন, তাতে যে কোনও মুহূর্তে সেটা 'দুম' হবে, আর সেটা হওয়া মানেই এলাকায় সূর্য ডুবলে ঘোর অমাবস্যা! অনেকদিন ধরেই ট্রান্সফর্মারটার ডেঙ্গি হয়েছে। খুব দুর্বল। প্লেটলেট এত্ত কমে গিয়েছে যে কয়েকটা আলো জ্বালতে কি পাখা ঘোরাতেই দম বেরিয়ে যায় বেচারার। ফলে পদমতির গেরস্থ বাড়িতে আলো ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে জ্বলে। দিনে বেশ কয়েকবার মূর্ছা যায়। ডাক্তারদের জন্য সরকারের কাছে কম দরবার করেননি গেরস্তকুল। কিন্তু পাত্তা পাননি। তাই খুব টেনশনে দিন কাটাচ্ছেন। কবে যে ডেঙ্গি মার্কা ট্রান্সফর্মার আর

ডেংগি বললে কিন্তু খেলব না

ম্যালেরিয়া মার্কা আলো বেহেস্তে চলে যায়, কে জানে!

ভো ভো গম্মেন্ট

রাস্তা না নালা তা রীতিমতো পর্যবেক্ষণ করবার বিষয়। সত্যিই এমনটাই খারাপ হালত যে বোঝার কোনও উপায় নেই। শুনতে কিছুটা অতিপ্রাকৃত মনে হলেও এটিই সত্যি! তায় আবার হিলি ব্লকের পাঞ্জুল গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তা, যেটি নাকি পাঁচ-সাতটি গ্রামের প্রধান সড়ক। পাঞ্জুল গ্রামের পথ প্রাঞ্জল হবে— এটাই ছিল আশা। অথচ দেখুন পথে নামলে প্রাণ একেবারে ভয়ে জল হয়ে যাচ্ছে। পথিক পথে নর্দমার সঙ্গে হাঁটে। নোংরা জলের ভুবনখেকো গন্ধ অঙ্গে নিয়ে ভাল রাস্তায় বাস-রিকশা-টোটোয় ওঠার জন্য দাঁড়ালে চালকরা গাড়ি দূষণের ভয়ে চম্পট দেয়। অভিযোগ শুনে পঞ্চায়েত উদাসী চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, বিরোধী পঞ্চায়েত বলে গম্মেন্ট পাত্তা দিচ্ছে না। তা-ই বুঝি? ভো ভো গম্মেন্ট! অবলোকন করহ!

মন্দের ভাল

বিদিগিচ্ছিরি বৃষ্টিতে ডুয়ার্সে পুজোর আমেজে নোনা লাগলেও শেষ পর্যন্ত পর্যটনের ঢেউ জেগেছিল বটে! পর্যটন ব্যবসায়ীরা গোড়ায় গোমড়া মুখে বরুণদেবকে গালাগাল করলেও এখন তাঁদের মুখে চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। আসলে বৃষ্টি হলে ধুলোবালি ধুয়ে হাওয়া চকচকে হয়ে যায়। তখন অনেক দূর পর্যন্ত নজরে আসে। বৃষ্টি-ধোয়া হাওয়ায় এবার তাই হিমালয়ের বরফ-ঢাকা চুড়ো, বিশেষ করে কাঞ্চনজঙ্ঘা ডুয়ার্সের অনেক জায়গা থেকে পষ্ট দেখা গিয়েছে। বৃষ্টি ফুরালে শরতের ঝলমলে দিনে এটাই খুশ করে দিয়েছে পর্যটকের মন। হাতি-গন্ডাররাও দলে দলে

পর্যটক দেখতে নজরমিনারগুলির চারপাশে ঘুরঘুর করছে বলে খবর। ফলে, পুজো পর্যটন এবার হিট! অবশ্যি খারাপ খবরও দু'-চারটে যে নেই তা নয়। টুরিস্ট বহন করতে করতে জঙ্গল সাফারির হাতিগুলোর প্রায় স্পন্ডেলাইটিস হওয়ার জো! সাফারির রাস্তা অনেক জায়গায় খাস্তা হয়ে যাওয়ায় পর্যটকরা ফাঁকিতে পড়েছেন। গাড়ি ভাড়া শোনার পর কোনও কোনও পর্যটকের থ্রম্বোসিস হয়েছে বলে খবর। কী ভাবছেন? এই শীতে আসবেন? সে গুড়ে বালি। রিসর্ট হোটেল স-ব আগাম বুক্‌ড।

বাস্তুহাতি

মনিষ্যি যদি জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে টুরিস্ট হয়ে থাকতে পারে, তবে হাতিরা কেন পারবে না ভাই? তাই তো একদল হাতি পুজোর পর 'গোড়ম্‌বাবা ট্রাভেল এজেন্সি'র সঙ্গে যোগাযোগ করে নাগরাকাটার কলাবাড়ি এলাকার এক গ্রামে ক'দিন ছুটি কাটাচ্ছে। এক্কেবারে 'হোমস্টে' ধাঁচের ব্যবস্থা বলা যায়। দিনের বেলাটা গ্রামের গাছপালা ঘেরা জমিতে গপ্পগুজব করে কাটিয়ে দিয়ে রাত হলেই আমন ধানে ভরা খেত দিচ্ছে সাবাড় করে। এ হেন 'পাঁচতারা' মার্কা স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে অরণ্যে ফিরে যাওয়ার আশু কোনও

ওরে এটায় আছে

লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না তাদের মধ্যে। ফলে গ্রামবাসী ঘন ঘন ভিরমি খাচ্ছেন। বন দপ্তরের কাছে ব্যাপারটা 'কমন' না পড়ায় ঘন ঘন মিটিং-এর ডাক শোনা যাচ্ছে। আপাতত ক্ষতিপূরণ দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তা অবশ্যি বার হয়নি। ব্যাপারটা গোলমেলে রে ভাই! হাতির তো আর আপিস-ইশকুল-আদালত-ব্যবসা নেই যে ছুটি ফুরিয়ে যাবে! একটাই আশা, যেভাবে ডিনারে দু'-তিন বিঘে ধান সাবাড় করে চলেছে, তাতে বিঘে ফুরাতে বেশি দিন লাগবে না। কিলোগ্রাম নয়, পাক্কা এক 'গ্রাম' ধান খেতে যদ্দিন লাগে আর কী! কে জানে রে কর্তা! এবার বোধহয় বাস্তুহাতির দিন এল!

লেবু-কথা

নভেম্বর পড়তে না পড়তেই বাজারে কমলালেবু? আসছে কোত্থেকে? ভুটানের লেবুকুল তো এখনও সবুজ হয়ে গাছে ঝুলে আছে। কমলা হয়ে নামতে নামতে ডিসেম্বর। জানা গেল, ডুয়ার্সের বাজারে ভারী চেহারার হালকা কমলা রং ধরা লেবুদের আগমন নাগপুর থেকে। দাম শুনলে প্রথমে উলটো দিকে দৌড়াতে ইচ্ছে করে। নিজেকে বুঝিয়েসুজিয়ে যদিও বা কিনে একটা কোয়া মুখে দিলেন, তবে আর রক্ষে নেই! বাঁধানো দাঁতসুদ্ধু টকে যাবে! কে জানি রস করে গেলাসে ভরে এক চুমুক দিয়েছিল। তারপর প্রায় তিন মাইল দৌড়েছিলেন। বাড়ি থেকে শনি তাড়াতে গেলে এইসব লেবুর এক টুকরো পুজোয় নিবেদন করলেই নাকি কাম ফতে! কিন্তু এতসব দুর্নাম সত্ত্বেও লেবু বিক্রি হচ্ছে। দেখতে বেশ সরেস বলেই হয়ত ফাঁদে পা দিচ্ছেন ক্রেতারা। তবে আশার কথা এই যে, এবার ভুটানে নাকি দেদার কমলা ফলতে চলেছে। ডুয়ার্সে এবার 'অরেঞ্জ ওয়াশ' হচ্ছেই।

হুঁ হুঁ বাবা

হাতির গুন্ডামি থেকে বনবস্তিগুলোকে রেহাই দেওয়ার জন্য দু'দশকেরও আগে বিদ্যুৎ বেড়া বসিয়েছিল বন দপ্তর। গোড়ায় দু'-চার বছর ম্যাজিকের মতো কাজ দিয়েছিল। হাতি বিদ্যুতের ধাক্কা খেয়ে হতভম্ব চেহারা নিয়ে ফিরে যেত। কিন্তু অচিরেই তারা বড় বড় গাছ তুলে এনে গুঁতিয়ে তারের বেড়া অচল করে দিতে থাকে। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, বেড়া লাটে তুলে দেওয়ার কাজে তারা আরও সূক্ষ্মতা অর্জন করেছে। এখন নাকি দলনেতা বেড়ার দিকে পিছন ফিরে লেজটা টানটান করে বাড়িয়ে দেয়। লেজের ডগা দিয়ে তার একটুখানি ছুঁয়ে দেখে। শক পেলেই চিৎকার করে দলকে সাবধান করে দেয়। তারপর হরেক ব্যবস্থা আছে। খুঁটির যে অংশে তার জড়ানো নেই, সেটা শুঁড় দিয়ে টান মেনে তুলে দেয়। বেড়ার খুঁটি বাচ্চা হাতিরা খেলাচ্ছলেই তুলে ফেলতে পারে, সুতরাং বড়দের কাছে এটা কোনও পরিশ্রমই নয়। কে অত গাছ বয়ে নিয়ে আসে! এই তথ্য জানার পর বনবস্তি আর বনকর্তা উভয়েরই মাথায় হাত। মোটের উপর হাতিরা বুঝে গিয়েছে যে 'তার' ব্যাপারটাই গোলমেলে। ওটা না ছুঁয়ে কেল্লা ফতে করতে হবে। করছেও। হুঁ হুঁ বাবা!

হায় হায়

মন্দিরে বিয়েটা নির্বিবাদেই হয়েছিল। পাত্রপাত্রী ছাড়া হাজির ছিলেন কেবল পাত্রীর শ্বশুর। বাপের উপস্থিতিতে পোলা চুপিচুপি মন্দিরে মাইয়া নিয়ে বিয়ে করতে কেন এসেছে, সে নিয়ে কেউ কেউ চিন্তা করলেও ভুলে গিয়েছিলেন। তা বিয়ে করে নববধূর পাণিগ্রহণ করে বরবাবাজি বউয়ের শ্বশুরসহ মন্দির থেকে বেরুতেই তাদের খপ করে পুলিশ ধরে ফেলল। কী ব্যাপার? কী

কাহিনি? কী কাণ্ড? না, মেয়ের বয়স মোটে ষোলো। অতএব নাবালিকা বিবাহের দায়ে বাপ সমেত বর সোজা হাজতে। আসলে বিয়ে ওদের হতই। বাড়ির লোকেরা বলেছিল, মেয়ে সাবালিকা হতেই শুভকাজটা সেরে ফেলা হবে। কিন্তু বরের সবুর সইছিল নাকো। বাবাকে পটিয়ে মন্দির ম্যারেজটা সেরে ফেলতে গিয়েছিল তাই চুপিচুপি। কিন্তু কে বা কাহারা জানি পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছে। হায় হায়! কারা করল এমন কাণ্ড? অকুস্থল ধূপগুড়ি শহর।

টুক্রাণু

মাথাভাঙায় সেতুভঙ্গ হেতু ঘোর গোলমাল। কারা জানি শিলিগুড়ির কাছে রাস্তার ধারে সাত লিটার স্কচ-হুইস্কি তৈরি করার স্পিরিট রেখে গিয়েছে। কেন্দ্রের উপহার দেওয়া জঞ্জাল সাফাইয়ের যন্ত্র নিজের কেনা বলে চালাচ্ছে জলপাইগুড়ি পুরসভা— বলছেন বিরোধীরা। একের পর এক গোরু-চোর গ্রেপ্তার ডুয়ার্সে। আট হপ্তা রেশন না পেয়ে বিন্নাগুড়ি বাজারে জোরদার পথ অবরোধ চলল। কাউন্সিলর কাম শ্রমিক-নেতার নামে দেড় কোটি টাকার চা-পাতা হাপিস করার অভিযোগ জানাল মানাবাড়ি বাগানের মালিক। পোকা কামড়িয়েছে শোনার পর চিকিৎসক দ্বারা অ্যান্টিভেনাম প্রদান এবং গ্রহীতার মৃত্যু ডুয়ার্সে। ডেঙ্গি ক্রমেই ডেঞ্জারাস!

হেমন্তের পড়ন্ত বেলায় ডুয়ার্স

আকাশের কংক্রিটের জঙ্গলে শীত, গ্রীষ্ম আর বর্ষা ছাড়া অন্য ঋতুগুলোকে আলাদা করে চেনা যায় না। দেশের অন্য মহানগরগুলির তুলনায় কলকাতার দশা আরও বেশি খারাপ। বেঙ্গালুরু বা দিল্লিতে তা-ও কিছু গাছপালা চোখে পড়ে বটে, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, কলকাতা প্রতিনিয়ত শুষ্ক হয়ে পড়ছে। অথচ ডুয়ার্সে প্রকৃতি এখনও অকৃপণ। হেমন্ত মানে সেখানে রহস্যময়ী কুয়াশার আস্তরণ। হেমন্ত মানে হিমের রাতে ভুতুড়ে আঁধার। হেমন্ত মানে দীপান্বিতায় আলোর উৎসব। এবং হেমন্ত মানে আকাশপ্রদীপ জ্বালানো।

ডুয়ার্সের অনেক জায়গাতে এখনও আকাশপ্রদীপ জ্বালানো হয়। জিনিসটা বেশ মজার। রঙিন কাগজের ঘেরাটোপে একটি মাটির প্রদীপকে বাঁশের ডগায় বেঁধে উঁচুতে তুলে দেওয়া হয়। সে বড় সহজ কাজ নয়। প্রবীণ মানুষরা বলেন, দেবতারা এবং বিগত পূর্বপুরুষদের আত্মারা যাতে শূন্যমার্গে ঘন কুয়াশায় পথ হারিয়ে না ফেলেন, সে জন্য দীপটি তুলে ধরার প্রথা। সত্যি বলতে, হেমন্তের আকাশপ্রদীপ জ্বালানোর তাৎপর্য যা-ই হোক না কেন, সেটি যে অত্যন্ত নয়নমনোহর একটি দৃশ্য, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই হেমন্তেও রাজাভাতখাওয়া, বড়ডাবরি, মূর্তি, জলঢাকা, সুনতালেখোলা, প্যারেন, মংপং, লেপচা জগৎ, রসিক বিলের গেরস্তবাড়ির উঠোনে শিউলি ফোটে। ছাতিমের গন্ধ এখনও হানা দেয় নাসারন্ধ্রে। এই বিশেষ ঋতুতে লক্ষ লক্ষ শ্যামাপোকা জন্ম নেয় ঝাঁক বেঁধে। কী আশ্চর্য জীবন তাদের, ঠিক স্ফুলিঙ্গের মতোই। ক্ষণজীবী এই হৈমন্তী পোকারা বুঝি মরবার জন্যই জন্মায়। মানুষ ভাল করেই জানে, আগুন দেখলে পোকারা আর স্থির থাকতে পারে না। তারা দূর থেকে ছুটে এসে আগুনে ঝাঁপ দেয় দলে দলে। আমাদের দীপাবলি, সারা দেশের দেওয়ালি আসলে কালী আরাধনার পিছনে এক বিরাট নিধনযজ্ঞ। পোকা মারবার জন্যই সারা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রদীপ আর মোমবাতি জ্বালানো।

হেমন্ত হল সম্পন্নতার ঋতু। এ সময় বিস্তীর্ণ ডুয়ার্সের হাটেবাজারে ওঠে নতুন চাল, ছোট ছোট নাকফুল-কানফুলের মতো সাইজের ফুলকপি, টেনিস বলের মতো বাঁধাকপি। তার পরতে পরতে ঢুকে থাকে হেমন্তের কুয়াশা আর শিশিরের জল। আজকাল সারা বছর ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালং শাক পাওয়া যায়। কিন্তু জীবনে কিছু জিনিসকে প্রকৃতির রসচক্রের সঙ্গে মিলিয়ে যাপন করতে হয়। ফুলকপি যেমন। ফুলকপি রান্নার গোড়ার কথাই হল তার ভিতরের স্বাদটাকে সম্মান করা। ছোট করে কেটে, শুধু নুন আর অল্প কালোজিরে দিয়ে ভেজে, কম তেলে জল ছিটিয়ে ঢেকে ঢেকে নরম করে আনতে হয় সেই স্বাদ। তারপর সেটা খেতে হয় আস্তে আস্তে, মুখের ভিতর যেন গলে যায় ছোট দানাগুলো জিবের চাপে, তবেই না তৈরি হয় একটা রূপকথা!

হেমন্তের ভোরের মায়াবী সৌন্দর্য আছে। এ সময় ডুয়ার্সের গ্রামে গ্রামে গলায় কলসি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে খেজুর গাছ। সূর্য ওঠার আগে মাটির হাঁড়িতে রস বিক্রি করতে আসে ব্যাপারী। সেই রসে জুড়িয়ে যায় প্রাণ। গেলাস গেলাস পান করেও তৃষ্ণা মেটে না। কখনও ডুয়ার্সে না-আসা মানুষের কাছে এই দৃশ্যকল্প অপরিসীম বিস্ময়ই শুধু বয়ে আনতে পারে!

চোরা বিশুষ্ক বাতাস উত্তর থেকে হেমন্তেই হিম বয়ে আনে। মানুষের মতো নিজেদের অভিব্যক্তি জানাবার ক্ষমতা গাছেদের নেই। কিন্তু টের পাওয়া যায়, তাদের বুক করে দুরুদুরু। শীত আসন্ন। এবার পাতা খসানোর খবর যথানিয়মে পৌঁছে গিয়েছে তাদের কাছে। হেমন্তের পড়ন্ত

বেলায় শীতের আবাহনের মরশুমে ডুয়ার্সের আনাচকানাচে শাল গাছের বড় বড় পাতা লাট খেয়ে খেয়ে খসে পড়তে শুরু করে। এখনও সেই দৃশ্য দেখে মুগ্ধতা জাগে। মনে হয়, প্রত্যেকটা পাতার পতনই যেন একটা ঘটনা।

সব বৃক্ষ যেহেতু পর্ণ মোচন করে না, আর এ দেশে যেহেতু তুষারপাত সেভাবে ঘটে না, তাই শীতপ্রধান দেশের বিখ্যাত 'ফল' আমাদের নেই। তবু এই সেই সময়, যখন শীত লেপের ওমের ভিতর চোরের মতো সিঁধ কেটে ঢোকে। ডুয়ার্সের শীত এখনও বিশুদ্ধ। কখনও কখনও যেন নির্মম। এদিকের শীত শরীরের প্রতিটি হাড়ে কাঁপন তুলে দেয় আজও।

এখনও তার পূর্ণ যৌবন, আর কিছুদিন পর হেমন্ত ব্যাটন বদলাবদলি করবে শীতের সঙ্গে। মৃদুমন্দ পায়ে নেমে আসবে গাঢ় কুয়াশার আস্তরণ। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি, কালী পুজোর পর থেকেই ঘরে ঘরে লেপ-কাঁথা রোদে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এখন অবশ্য ততটা না হলেও অঘ্রানের শুরু থেকেই রাতে শুতে গেলে গায়ে একটা গরম চাদর দেবার দরকার হয়। সন্ধের পর বেরলে দরকার হয় নিদেনপক্ষে হাফ সোয়েটার।

কংক্রিটের জঙ্গলে ঋতুচক্র টের পাওয়া সম্ভব নয়। গ্রীষ্ম-বর্ষা সম্যক বোঝা যায়, কিন্তু অন্য ঋতু নয়। যেমন ধরা যাক বিশ্রুত বসন্তকালের কথা। কাব্যে ও শাস্ত্রে বসন্তের বন্দনার অবধি নেই। বসন্ত হল প্রেমের ঋতু। হৃদয় বিনিময়ের উপযুক্ত কাল। সে হয়ত ছিল কখনও। কিন্তু এখন শীত যেতে না যেতেই বসন্তকে টপকে চলে আসে গরমকাল। শরৎ আর হেমন্তও বিপন্ন প্রজাতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংক্রিটের জঙ্গলে বছর বছর এই দুই ঋতু আসে বটে, কিন্তু তাদের বুড়ো বুড়ো, লাবণ্যহীন, ন্যুব্জপৃষ্ঠ চেহারা। শুধু আদলটুকুই বোঝা যায়, আর কিছু নয়। ডুয়ার্সে ফাঁকা পরিসর, প্রচুর গাছপালা, ঝোপঝাড়, খাল, বিল, পুকুর আর নদী আছে বলে সেখানে এখনও শরৎ ও হেমন্ত আসে স্বমহিমায়। কোকিলের ডাক শোনা যায়। আজও হাট-ফিরতি কিশোরের হাতের থেকে খাবারের ঠোঙা ছোঁ মেরে নিয়ে যায় চিল। পেঁচা আর বাদুড়ও কিছুমাত্র অমিল নয়। মাঝরাতে ডেকে ওঠে তক্ষক। বিমনা বিকেলে জানলার বাইরের শেফালি গাছে বসে থাকে নিশ্চুপ বুলবুলি।

হেমন্ত এক অপরূপ ঋতু। অন্তত এই পোড়ো বঙ্গভূমে। হেমন্ত যেমন জাদুবিদ্যা জানে, তেমন আর কেউ নয়। শরতের অপার্থিব আলো আর ছায়া, রোদের সঙ্গে মেঘবৃষ্টির খেলা হেমন্তে এসে প্রগাঢ় এক রহস্যের মোড়কে আড়াল করে দেয় সব কিছু। পৃথিবীকে এক গভীর রহস্যে ঢেকে দেয় সে। কলকাতায় হেমন্তের আবির্ভাব ম্যাড়মেড়ে হলেও ডুয়ার্সে তার মায়াবী সঞ্চার। রাজাভাতখাওয়া, বড়ডাবরি, মূর্তি, জলঢাকা, সুনতালেখোলা, প্যারেন, মংপং, লাভা, লোলেগাঁও, লেপচা জগৎ, রসিক বিলে আজও হেমন্ত নেমে আসে ধীরপায়ে। তার কুয়াশা, ছাতিম ফুল, মৃদু শীত আর কুহক নিয়ে। পুরনো জাদুবিদ্যা সে আজও ভোলেনি। লহমায় সে আজও চরাচর জুড়ে তার প্রবল মায়া বিস্তার করে দেয়। মানুষ সেই বশীকরণ মন্ত্রে আজও সম্মোহিত হয়।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

ছবি: উতঙ্ক দে

ডুয়ার্সের হাজার কবিতা

ডুয়ার্স ভূখণ্ডে কাব্যচর্চার বিশাল রূপ বাংলা সাহিত্যজগতে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে 'এখন ডুয়ার্স'-এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে 'ডুয়ার্সের হাজার কবিতা' বইটি। শতাধিক কবির সহস্রাধিক কবিতার এই অভূতপূর্ব সংকলনটি প্রকাশের পর অভিভূত হতে শোনা গিয়েছে অনেককেই। গত ২২ শ্রাবণ বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠানটিও ছিল জমজমাট। বাইরে থেকেও কবিতাপ্রেমীরা এসেছিলেন ঔৎসুক্য নিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। বইটির অলংকরণ ও কলেবর প্রশংসিত হয়েছে নানা মহলে। প্রথম থেকেই ঠিক করা হয়েছিল, এই বই প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করবেন কবিরাই। একটি বইয়ের দামে কবিদের দু'টি বই দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু বই প্রকাশের পর তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল, অথচ এখনও অর্ধেকের বেশি সংখ্যক কবি তাঁদের কপি সংগ্রহের ব্যাপারে উদ্যোগ বা উৎসাহ প্রকাশে বিরত। কবিতা পাঠানোর ব্যাপারে যে উৎসাহ লক্ষ করা গিয়েছিল, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বই প্রকাশের পর তা সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যতে এই ধরনের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উৎসাহে ভাটা পড়তে বাধ্য, যা মোটেই কাম্য নয়। কবি-বন্ধুদের তাই অনুরোধ, যাঁরা এখনও নিজেদের কপি সংগ্রহ করেননি, তাঁরা অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। আপনার হাতে বই পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে আমরা রাজি। আমরা চাই ডুয়ার্সের কাব্যচর্চার সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ুক।

প্রকাশক

ডুয়ার্স চা-সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ নারী শ্রমিক আগাগোড়াই অবহেলিত

উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিল্প চা-বাগিচা শিল্প। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় চা-বাগিচা শিল্পে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিক শোষণ, সরকারি উদাসীনতা, টি বোর্ডের পরিচালননীতির ব্যর্থতায়, তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভুল নীতি এবং আন্দোলনবিমুখতায়, নেতাদের স্বজনপোষণ কার্যকলাপে আর্থ-সামাজিক সংকটে জর্জরিত চা-বাগিচা শিল্প। এই নিয়েই সমস্যা, সংকট, উত্তরণের দিশা ধারাবাহিকভাবে 'এখন ডুয়ার্স'-এর কলামে। তুলে ধরছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা**। আজ **চতুর্থ পর্ব**।

প্রায় ৫০০০ বছর আগের গ্রীষ্মের এক সকালে ধু ধু প্রান্তর দিয়ে চিনের সম্রাট শেন নং তাঁর বহু অমাত্য, সৈন্য ও ভৃত্যের দল নিয়ে যাচ্ছিলেন বহু দূরের এক রাজ্য পরিদর্শন করতে। একে লম্বা সফর, তায় কিছু সময়ের জন্য যাত্রা স্থগিত রাখলেন। সবাই খুব ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত বলে ভৃত্যের দল আগুন জ্বালিয়ে জল গরম বসায়। ধু ধু প্রান্তর, মাঝে মাঝে ঘন ঝোপঝাড় এবং কিছু ছায়া ঘেরা গাছ, দমকা হাওয়ায় শুকনো ঝরা পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় কিছু শুকনো পাতা উড়ে গরম জলের পাত্রের মধ্যে পড়ল। এদিকে যাত্রা শুরু করতে হবে, নতুন করে জল ফোটানোর সময় কোথায়? তাই ভৃত্যরা সেই পাতা ফোটানো জলই এনে দিল সম্রাটকে পান করার জন্য। সম্রাট দেখলেন সাদা জল লাল হয়ে যাবার পাশাপাশি এক অদ্ভুত সুগন্ধও যুক্ত হয়েছে। সেই জল পান করে সম্রাট এবং পারিষদদের যাত্রার ক্লান্তি দূর হল। যে গাছের শুকনো পাতা জলে পড়েছিল, তার নাম 'ক্যামেলিয়া সাইনেনসিস'। এইভাবে খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩৭ অব্দে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে চা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

প্রথম চা আবিষ্কৃত হয় চিন দেশেই এবং বহু যুগ ধরে ওষধি হিসেবে এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। চিন দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে— শরীরের জন্য যে সাতটি প্রাথমিক পুষ্টির প্রয়োজন, তার মধ্যে প্রধান হল ভাত, তেল, নুন, সয়া সস, ভিনিগার এবং চা। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে প্রাত্যহিক পানীয় হিসেবে চা রীতিমতো জনপ্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে সুই ডাইনেস্টিতে চিন সম্রাট চা-পান রীতিকে বিশেষ মর্যাদা সহকারে গুরুত্ব দেন। বিশেষ কাজের পুরস্কার হিসেবে চা উপহার দেওয়ার নিয়মও প্রবর্তন করা হয়। ক্রমে ক্রমে চিন দেশ থেকে বিশ্বের নানান দেশে চা-পানের প্রচলন ছড়িয়ে পড়ে। শাস্ত্রশিক্ষা করতে যাওয়া জাপানি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাত ধরে

জাপানেও এই সময়ে চা-পান প্রচলিত হয়। জাপানে পাতা চায়ের বদলে গুঁড়ো চা গরম জলে গুলিয়ে তৈরি করা হয়। তবে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষই চিন দেশের মতো গ্রিন টি বেশি পছন্দ করেন। জাপানে চিন দেশের ফুজিয়ান জেলার উলং টি সর্বাধিক জনপ্রিয়।

১৬৬৪ সালে রানি এলিজাবেথ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত থেকে সেই সময়ে পশম বস্ত্র, ভেষজ, মশলা এবং কাপড় রপ্তানি হত। এই সময়ে একজন ডাচ পরিব্রাজক আসামের জঙ্গলে চা গাছ আবিষ্কার করেন। তিনি জানান, আসামের জংলি আদিবাসীরা চা-পাতা এবং রশুন একসঙ্গে জলে ফুটিয়ে অসুখের সময়ে খায়। পরবর্তীকালে একজন ব্রিটিশ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ জানান, উত্তর-পূর্ব ভারত চা ফলনের উপযোগী। এই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসাম ও চিন দেশ থেকে চা গাছের চারা ও বীজ এনে চাষ করা শুরু করে, এবং আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল চা-চাষের জন্য উপযোগী করে তোলে। চারদিকে গহন জঙ্গল, হিংস্র বন্য জন্তু, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, সূর্যের উত্তাপকে প্রতিহত করে ব্রিটিশরা চা আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করল।

১৬৬০ সালের আগে পর্যন্ত ইংল্যান্ডের লোকেরা চা-পাতা গরম জলে সেদ্ধ করে সবজি হিসেবে পাউরুটির সঙ্গে মিশিয়ে খেতেন ওষধি হিসেবে। খ্রিস্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই যা ছিল সীমান্ত চিনের আদিবাসীদের পানীয়, ব্রিটিশ শাসনের আগে যা ছিল সীমান্ত আসামের সিংফো উপজাতিদের প্রিয় পানীয় 'পাইন-আপ'— সেটাই আজ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের উষ্ণ আমেজ মাখা চা। গত দেড় শতকের বাণিজ্যিক ছোঁয়ায় চা এক বিরাট বাণিজ্যিক পরিবর্তন এনেছে। হাজার হাজার শ্রমিকের অশ্রুগাথার অনুরণন মাটিতে কান পাতলে আজও শোনা যায়। ভারতে চায়ের পথ চলা শুরু আসামে। তবে ব্রিটিশরা একে তাদের আবিষ্কার বললেও চা-পান করা আসামের সিংফো-খামতিদের পুরনো অভ্যাস। মহাচিনের আফিম যুদ্ধের পরবর্তীতে চা বাণিজ্যের বিষয়ে চিনের উপর নির্ভরশীল থাকা সম্ভবপর হচ্ছিল না ব্রিটিশ বেনিয়াদের। সে জন্য তারা বিকল্পের খোঁজ করতে শুরু করে। গত শতকের তিনের দশকে পামবারটন সাহেব ভুটান যাবার পথে পাহাড় থেকে দীর্ঘ, বিস্তীর্ণ ঘাসযুক্ত জঙ্গল দেখে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে ভাবছিলেন, এমন জমি পাওয়া গেলে ব্রিটিশ সরকারকে আর চা-আবাদের জন্য ভাবতে হবে না। ওই শতকের ছয়ের দশকে ডুয়ার্স অঞ্চল ভুটান সরকারের কাছ থেকে ব্রিটিশরা নিয়ে নেয়।

১৭৭৫ সাল। ভুটানে ব্রিটিশের প্রতিনিধি জর্জ বোগলে ডুয়ার্স সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, দুর্গম অস্বাস্থ্যকর এই এলাকা দখল পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছুই নয়, এলাকা জয়ের কোনও প্রয়োজনই নেই, কারণ এখানে লাভজনক কিছুই করা যাবে না। হাতির পিঠে করে দার্জিলিং যাবার পথে জোসেফ ডালটন হুকার সাহেব জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেখেছিলেন সাভানা ঘাসের মতো তৃণভূমি। বাংলার এই অঞ্চল তখন ছিল একেবারেই জনবিরল। বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছিল খড়ের ঘরবিশিষ্ট ছোট ছোট গ্রাম। কিন্তু কলকাতার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন ধূর্ত এবং দক্ষ প্রশাসক। বোগলের রিপোর্ট পেয়ে তিনি দমে যাননি। তাঁর নির্দেশে ১৭৭৮ সালে স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে রিপোর্ট এল, বিহার এবং কোচবিহারে চা-চাষ সম্ভব। এই সময়ে চিন থেকে আনা চা বীজও বোগলের কাছে পাঠানো হয়। ১৮৩৪ সালে বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক সিকিমের মহারাজার কাছ থেকে শিভালিয়া পর্বতমালার দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চল ইজারা নিলেন বার্ষিক ৬ হাজার টাকার বিনিময়ে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসক ডঃ ক্যাম্পবেলকে চিনে পাঠানো হল চা-চারা রোপণের কলাকৌশল শিখে আসতে। ১৮৭৪ সালে ডুয়ার্সে চা-আবাদের জন্য জমির বিলিবন্টন শুরু হয়ে গেল। ডুয়ার্স ছিল ম্যালেরিয়া আর ব্ল্যাক ওয়াটার রোগের ডিপো, কিন্তু আবহাওয়া ছিল চায়ের অনুকূল। দার্জিলিঙের চা-কর ডঃ ব্রুহাম প্রথম নজর দেন নতুন ডুয়ার্স এলাকায়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে গাজলডোবায় প্রথম চা-বাগান স্থাপন করার প্রয়াস নেওয়া হয়।

পিলানস সাহেব খুললেন ফুলবাড়ি, বিখ্যাত চা ব্রোকার ডব্লিউ এস গার্সওয়েল সাহেব মিঃ নর্থকে দিয়ে খোলালেন

ডুয়ার্স ছিল ম্যালেরিয়া আর ব্ল্যাক ওয়াটার রোগের ডিপো, কিন্তু আবহাওয়া ছিল চায়ের অনুকূল। দার্জিলিঙের চা-কর ডঃ ব্রুহাম প্রথম নজর দেন নতুন ডুয়ার্স এলাকায়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে গাজলডোবায় প্রথম চা-বাগান স্থাপন করার প্রয়াস নেওয়া হয়। গণ্ডগ্রাম জলপাইগুড়িকে সদর দপ্তর হিসেবে নির্বাচিত করে ১৮৭৬ সালে ফুলবাড়ি, গাজলডোবা, বাগরাকোট, ডালিমকোট, রাঙাতি চা-বাগানকে গ্রান্ট দেওয়া হয়।

বাগরাকোট। চা-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে এলাকা জুড়ে বসতি গড়ে তোলার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়। গণ্ডগ্রাম জলপাইগুড়িকে সদর দপ্তর হিসেবে নির্বাচিত করে ১৮৭৬ সালে ফুলবাড়ি, গাজলডোবা, বাগরাকোট, ডালিমকোট, রাঙাতি চা-বাগানকে গ্রান্ট দেওয়া হয়। ১৮৭৭ সালে এই জেলার প্রথম ভারতীয় মুনশি রহিম বক্স এবং পরের বছর কাঠ ব্যবসায়ী বাবু বিহারীলাল গঙ্গোপাধ্যায় চা-বাগিচা জমির গ্রান্ট পান। বাগান দু'টির নাম ছিল জলঢাকা আর আলতাডাঙা। ১৮৭৭ সালে বেতবাড়ি, বামনডাঙা,

এলেনবাড়ি, ডামডিম, কুমলাই, ওয়ানাবাড়ি গড়ে ওঠে। ১৮৭৮ সালে কলাবাড়ি কেনেন বিখ্যাত চিকিৎসক নীলরতন সরকার। পরে সেটি কিনে নেন তারিণীপ্রসাদ রায়। গড়ে ওঠে গুডহোপ, রানিচেরা, মানাবাড়ি, বালাবাড়ি, মানিহোপ (ফুলবাড়ি), পাতাবাড়ি। ১৮৭৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রর পিতা ভগবানচন্দ্র বসুর উৎসাহে মোগলকাটা চা-বাগানের পত্তন হয়। কোম্পানির নাম হয় জলপাইগুড়ি টি কোম্পানি লিমিটেড।

চা-বাগিচা গড়ে ওঠার ইতিহাসের পাশাপাশি শ্রমিকদের সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় দমন-পীড়ন এবং অত্যাচার সত্ত্বেও শ্রমিকরাই ছিল চা শিল্পের মূল বনিয়াদ। সাঁওতাল, হো, মুন্ডা, ওরাওঁ আদিবাসী শ্রমিকরা হাওড়া থেকে রামপুরহাট-সাহেবগঞ্জ হয়ে উত্তরবঙ্গে রেললাইন পাতার কাজ করেছিল সেই অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে। কারণ রেললাইন পাতার সময়ে পাশের জমি থেকে মাটি কিনে রেললাইনের ভিত উঁচু করা, পাথর ভাঙা, স্লিপারের জন্য গাছ কাটা, মাপমতো স্লিপার কাটার পরিশ্রম— সব কাজেই দক্ষতা দেখিয়েছিল শ্রমিকরা। জঙ্গলমহলের এই আদিবাসীদের দিনরাতের পরিশ্রমের ফলে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল রেললাইন পাতার কাজ। অবিভক্ত বাংলার পুরুলিয়া, মেদিনীপুর এবং বিহারের ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনার আদি বাসিন্দা এই জনগোষ্ঠী শুধু অত্যন্ত পরিশ্রমীই নয়, এরা কখনও মিথ্যে বলে না, ভিক্ষা করে না, স্বাধীনচেতা হলেও বিনয়ী এবং নম্র। ব্রিটিশরা মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা আর বিহার থেকে আইনের নানা মারপ্যাঁচে আদিবাসীদের জমি থেকে উৎখাত করেছিল। কোল, সাঁওতাল এবং মুন্ডা বিদ্রোহে এদের উৎখাত হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। এই আদিবাসীদের কুলি হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছিল সর্দার, আড়কাঠি আর স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায়। চা-বাগানে নিয়োগ করা হয়েছিল পরিবারভিত্তিক। সাপখোপ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের দুর্গম বনমহল কেটে চা-বাগান গড়তে এই ধরনের কুলি তথা শ্রমিকদের আসামে এবং ডুয়ার্সে তুলে আনতে আড়কাঠি লাগানো হল। জমিদারি শোষণ, চুয়াড় বিদ্রোহ, ১৭৭০ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণে পিতৃপুরুষের জঙ্গলমহল ছেড়ে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়ায় এসে মানিয়ে নিচ্ছিলেন যাঁরা, তাঁদের স্বর্গসুখের মিথ্যা

প্রলোভন দিল আড়কাঠিরা। তারা সাঁওতাল পরগনা, ছোটনাগপুর এবং জঙ্গলমহলে ঘুরে ঘুরে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা আদিবাসীদের মধ্যে মিথ্যার জাল বিস্তার করে তাদেরকে সপরিবার চা-বাগিচায় নিয়ে আসতে লাগল।

চা-বাগিচাগুলিতে মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছিলাম বীরপাড়া-বানারহাট অঞ্চলের চা-বাগিচায়। সমস্যা হয়েছিল একাধিক। ভাষা বুঝি না। আমার চেহারা ও জামাকাপড় দেখে বোধহয় তথাকথিত 'ভদ্দরনোক বাবু' ভেবে লজ্জায় জড়সড় হওয়া, কয়েকজনের কোনও কিছু বলতে না চাওয়া, কেউ আবার 'কামকাজ' বন্ধ থাকবে কথা বলতে গেলে— ভেবে বিরক্ত। কারণ, ওভারটাইম করলে দু'টি পয়সা বাড়তি আসবে। তবে সামগ্রিকভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য বলছে, জলপাইগুড়ি জেলায় ছোটনাগপুর, রাঁচি, লোহারদাগা, নেপাল, ভোজপুর থেকে আসা নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হলেও স্থানীয় কিছু মহিলাকেও চা উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। চা-পাতা তোলার ক্ষেত্রে সার প্রয়োগ, হালকা চা গাছ ছাঁটাইয়ের কাজে নারী শ্রমিকদের দক্ষতা কোনও অংশে কম তো নয়ই, বরং অনেক বেশি। সুচারুভাবে কাজ তুলে দেবার দক্ষতা মহিলাদের মধ্যেই বেশি। কাজের প্রতি আগ্রহ, দায়িত্বজ্ঞান, উপরওয়ালার নির্দেশমাফিক গুছিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের যোগ্যতা নিঃসন্দেহে পুরুষদের তুলনায় বেশি। অনুপস্থিতির ব্যাপারে মহিলাদের চাইতে পুরুষদের সংখ্যাই বেশি। মহিলা শ্রমিকদের শিক্ষার সুযোগের অভাবই তাদের উন্নতির মূল অন্তরায়। একজন পুরুষ শ্রমিক যেমন বাইরে গিয়ে বিশেষ শিক্ষা নিয়ে ফিরে এসে পদোন্নতির সুযোগ করে নিতে পারে, নারী শ্রমিকদের সামনে সেই সুযোগ খুবই কম। নারী শ্রমিকদের যে পরিবেশে কাজ করতে হয় তা তেমন উন্নতমানের নয়। নারী শ্রমিকদের মূল অভিযোগ চিকিৎসা ও চিকিৎসক নিয়ে। অধিকাংশ বাগিচাতেই ডাক্তার নেই, থাকলেও মহিলারা পুরুষ চিকিৎসকদের সামনে স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত আলোচনা করতে সংকোচ বা লজ্জা বোধ করেন। তাই লক্ষ করা যায়, মহিলারা চিকিৎসকদের পরামর্শ না নিয়ে তুকতাক-জড়িবুটি, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির আশ্রয় নিচ্ছে মেয়েলি রোগের চিকিৎসার জন্য। যে বাগানগুলিতে সমীক্ষা চালিয়েছি, তার অন্যতম বানারহাট টি গার্ডেনের মহিলা শ্রমিকদের শতকরা ১৫ জনই জানিয়েছেন, তাঁরা মেয়েলি রোগের চিকিৎসার জন্য বাগিচার ডাক্তারবাবুর কাছে যান না।

বাগিচায় কর্মরত নারী শ্রমিকদের অভিযোগের তালিকা প্রায় একই। ডামডিম, বীরপাড়া টি এস্টেট, হাসিমারা টি এস্টেট, বানারহাট টি এস্টেট প্রতিষ্ঠিত বাগানগুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু নারী শ্রমিকদের অভিযোগগুলি ক্রমান্বয়ে সাজালে যে চিত্র উঠে আসে তা হল— ম্যানেজারিয়াল পদের কর্মকর্তাদের খারাপ ব্যবহার, পানীয় জলের অভাব, জ্বালানির অভাব, ঔষধপত্রের অপ্রতুলতা, বাসস্থানের প্রয়োজনীয় মেরামতির অভাব এবং অবশ্যই বৎসরান্তের বোনাস। নারী শ্রমিকদের যে পরিবেশে কাজ করতে হয় তা উন্নতমানের নয়। নারী শ্রমিকদের তাঁদের শিশুদের বিষয়ে সর্বদাই মানসিক অশান্তি বা দুশ্চিন্তা নিয়ে কাজ করতে হয়। নারী শ্রমিকদের কাজের জায়গায় বা তার আশপাশে কোনও ল্যাট্রিন বা টয়লেটের ব্যবস্থা নেই বলে শতকরা ৯৮ জনই অভিযোগ করেছেন।

ক্ষেত্রসমীক্ষার নির্যাসটুকু নিংড়ে নিলে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার পর শোষক শ্রেণি এখন ভারতীয় বেনিয়ারা, যাদের কেউ কেউ চা-বাগিচা কিনছে, আবার কিছুদিন পর অন্য মালিককে বিক্রি করে দিচ্ছে। ফলে বাগিচা শ্রমিক আইন নিয়ে ভাবছে না প্রায় কেউই। শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক পরিবেশ নিয়েও কোনও চিন্তাভাবনা নেই ডুয়ার্সের মালিকপক্ষের। প্রতিটি বাগিচাতেই প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র অপ্রতুল। চা-বাগিচার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দিকে তেমন নজর দেওয়া হয় না। মহিলা ডাক্তার নেই,

> জমিদারি শোষণ, চুয়াড় বিদ্রোহ, ১৭৭০ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কারণে পিতৃপুরুষের জঙ্গলমহল ছেড়ে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়ায় এসে মানিয়ে নিচ্ছিলেন যাঁরা, তাঁদের স্বর্গসুখের মিথ্যা প্রলোভন দিল আড়কাঠিরা। তারা ঘুরে ঘুরে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুন্ডা আদিবাসীদের মধ্যে মিথ্যার জাল বিস্তার করে তাদেরকে সপরিবার চা-বাগিচায় নিয়ে আসতে লাগল।

বাগিচা সংলগ্ন প্রাথমিক বা হাই স্কুলগুলিতে ইদানীং সরকারের বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণ তহবিল, যেমন— সবুজ সাথী, কন্যাশ্রী, মিডডে মিল ইত্যাদি কারণে নারী শ্রমিকদের সন্তানসন্ততির উপস্থিতি বাড়ছে ঠিকই, তবে ভাষাগত কারণে তাদের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ঘটছে না। মা কাজে গেলে ছোট মেয়েদেরই সংসারের টুকিটাকি কাজকর্ম করতে হয় বলে নির্দিষ্ট ক্লাসের পর ড্রপ আউটের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ৮৫ শতাংশ নারী শ্রমিক অশিক্ষিত এবং নিরক্ষর। ইদানীং আগ্রহ কিছুটা বেড়েছে। বাগিচার বিদ্যালয়গুলিতে ভাষা শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও আগ্রহী করার জন্য শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। ক্ষেত্রসমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বাগানগুলির শতকরা ৯৫টি বাগানেই মহিলা শ্রমিকদের জন্য আমোদ-প্রমোদের তেমন কোনও বন্দোবস্ত নেই। যা রয়েছে তা শুধুমাত্র পুরুষ শ্রমিকদের জন্যই।

ডুয়ার্সের নারী শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৮৮ জনই বিবাহিত। এঁদের বিবাহের বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনরায় বিবাহের সংখ্যা মাত্র ৭ শতাংশ। পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ জনই ওয়াকিবহাল। কিন্তু এই পদ্ধতি গ্রহণ বা বর্জন কোনওটাই তেমনভাবে করেননি। অশিক্ষা থেকে উদ্ভূত নানান কুসংস্কারবশত পরিবার পরিকল্পনা বিষয়টি মনেপ্রাণে গ্রহণীয় হয়ে ওঠেনি। অন্য দিকে, পরিবারের সদস্যসংখ্যা কত হবে তা পুরুষরাই ঠিক করেন। অর্থাৎ পুরুষদের মতামতই এখানে অগ্রাধিকার পায়। বাগিচায় কাজ করা বাদেও মেয়েদের অতিরিক্তভাবে সংসারের কাজকর্মের ঝামেলা পোয়াতে হয়। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, সাংসারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষরাই শতকরা ৯৫টি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ডুয়ার্সের ক্ষেত্রসমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বাগানগুলির অধিকাংশেরই একটি শ্রমিক পরিবারের সদস্যসংখ্যা গড়ে ৬ জন। শতকরা ৯৬ জনই বাগিচাকর্মে নিয়োজিত। বাদবাকিরা অধিকাংশই বাগিচা সংযুক্ত বস্তি অঞ্চলে কৃষিকাজে নিয়োজিত। কোনও কোনও বাগিচায় চা এবং মুদি দোকান খুলে বসার ছবিও চোখে পড়েছে। শতকরা ৯০ শতাংশেরও বেশি পরিবার ঋণগ্রস্ত। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ— এই তিনটি কারণে। শ্রমিক পরিবারের শতকরা ৯৮ জনই সঞ্চয়ে আগ্রহী, কিন্তু খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, চিকিৎসা, লোকাচার, সামাজিক অনুষ্ঠান খাতেই সব ব্যয় হয়ে যায় বলে সঞ্চয় হয়ে ওঠে না বললেই চলে। তবে ক্ষেত্রসমীক্ষায় লক্ষ করলাম, নারী শ্রমিকদের চেতনার মানোন্নয়ন ঘটছে।

প্রায় তিনশোর বেশি বাগানের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার এখনও শেষ শক্তি দিয়ে জীবন-জীবিকায় রত। শ্রমিকদের পাশাপাশি চা-বাগানের অসংখ্য স্টাফ এবং সাব-স্টাফদের অবস্থাও অবর্ণনীয়। সব জেনেও নির্বিকার রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার। ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডেকে স্থায়ী সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ সরকার। সরকারের এহেন উদাসীনতায় মালিকপক্ষের পোয়াবারো। কোনও দাবিই মানতে চায় না তারা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা দফায় দফায় আসেন, কথাও বলেন শ্রমিক, মালিক এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে। বাদ যান না কোনও পক্ষই। কিন্তু তথাপি বন্ধ বাগান খোলা থেকে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, যা আজও অধরা ক্রুটিভুক্ত এবং অসহায় শ্রমিকদের কাছে এসব নিয়ে কোনও ইতিবাচক বা সদর্থক পদক্ষেপের কথা আর ঘোষণা করা হয় না।

বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় রসদের সংস্থান না থাকলে চা শ্রমিকদের দুর্দশার কোনও শেষ থাকবে না। অর্ধাহার, অনাহারের মৃত্যুমিছিল ঠেকানো তো কার্যত অসম্ভব হয়ে যাবে। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি, জমির অধিকার— মূল এই বিষয়গুলিকে বাস্তবায়িত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে। প্রকৃত প্রতিবিম্বের জন্য তাই এখনই প্রয়োজন সরকারি উদাসীনতার ঘোর কাটানো। সরকারের প্রকৃত উদ্যোগই পারে শ্রমিকদের আস্থা ও বিশ্বাসের মোড় ঘোরাতে।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 15,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

দেবপ্রসাদ রায়

গনি খানের মালদার বুকে গনি খানকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে সভা ডাকল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। লেখকসহ সাতজন সেই কারণে ট্রেনে চেপে রওনা দিলেন মালদায়। টিকিট কাটার বদলে 'ডব্লিউ টি'তে যাত্রাই স্থির হল। তারপর এক 'ঐতিহাসিক' ট্রেন সফরে মালদার সভায় হাজির হতে পারলেন সবাই। লেখক তাঁর বক্তৃতায় জরুরি অবস্থা বিষয়ে বক্তব্য রেখে বেশ প্রশংসা পেলেন, কিন্তু একজন প্রৌঢ় তাঁর সামনে অকস্মাৎ খুলে দিল বিপরীত এক জানালা। এক বিচিত্র সফর এবং এক উপলব্ধির পর্ব এই সংখ্যায়।

২০

যদিও সঞ্জয়জির সামনে বরকতদা বললেন যে, সোমেন ছোট ভাই। আমি ওর সঙ্গে মিটিয়ে নেব। কিন্তু রাজনীতিতে একবার সম্পর্ক ভাঙলে তা কখনওই আর পুরনো চেহারায় ফেরে না। কাচের ফাটলের দাগটার মতো থেকেই যায়। তাই ভিতরে ঠান্ডা লড়াই জারি রইল। মালদা থেকে বরকতদার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল বুলু (সুখেন্দুশেখর রায়)। কোনও কারণে বরকতদার বিরাগভাজন হতে শুরু করেছিল সে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে শুরু করে। বরকতদার অসন্তোষের কথা মাথায় রেখেই পুনর্গঠিত রাজ্য যুব কংগ্রেসের কমিটিতে বুলুকে করা হল সাধারণ সম্পাদক।

মালদায় বরকতদাই যে শেষ কথা নয়, তা প্রমাণ করবার জন্য বুলু ঠিক করল, মালদায় যুব কংগ্রেসের নামে সভা করবে এবং যুব কংগ্রেস যে বরকতদার অঙ্গুলিহেলনে চলবে না, তা মালদার বুকে দাঁড়িয়ে জানানো হবে। বলাই বাহুল্য যে, মালদায় গিয়ে বুলুর পাশে দাঁড়াতে আমরা সবাই রাজি হয়ে গেলাম। বেশ বড় টিম। আমি, বীরেনদা, সোমেনদা, নুরুলদা, আনন্দদা, দীপংকর, পরেশ পাল-সহ সাতজন। কিন্তু মালদা যাব কীভাবে? তখন চলাফেরা করার প্রথম প্রতিবন্ধকতা ছিল অর্থাভাব। বুলু বলল, 'রাতে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন যায়, ওটায় কোনও টিকিট কাটতে হয় না।'

এর চেয়ে আর ভাল ব্যবস্থা কী হতে পারে! রাত আটটায় ট্রেন। সদলবলে সময়মতো পৌঁছে গিয়ে শুনি ট্রেন তিন ঘণ্টা লেট। যা-ই হোক, যেতে হবে। ঠিকই ছিল, টিকিট কাটা হবে না। আমি তবু প্রস্তাব দিলাম যে, আমরা অন্তত একটা করে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে নিই। সোমেনদা বললেন, 'ছাড়ো তো। কে ধরবে?' একটাই ফার্স্ট ক্লাসের বগি ছিল, তা-ও আড়াই কুপের। দশটা বার্থ। আনন্দদা বললেন, 'টিকিটের ব্যাপার যখন নেই, তখন ফার্স্ট ক্লাসেই যাই।' বলামাত্র বার্থগুলো আমাদের দখলে চলে এল। ফার্স্ট ক্লাস জুড়ে সবটাই আমরা। গাড়ি ছাড়ার সময় এগিয়ে আসছে। আমরা কেউ ভিতরে, কেউ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। আনন্দদা একটা কুপেতে বিছানা পাতার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। এমন সময় কোর্ট-প্যান্ট-টাই পরা এক ভদ্রলোক এসে আনন্দদাকে বললেন, 'আপনার টিকিট?'

আনন্দদা হতচকিত হয়ে বলে উঠলেন, 'মাই টিকিট ইজ উইদ ডে-ডে পি রায়।'

ঘটনার আকস্মিকতায় আনন্দদার তোতলামি শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি নিচে, জানালার পাশে। বিপদ বুঝে জানালা দিয়ে বললাম, 'একটু ভুল হয়ে গিয়েছে। আনন্দদা, আমাদের টিকিট পাশের কোচে, স্লিপারে।'

উনি নেমে এলেন। বাকিরাও জটিল বুঝে আস্তে আস্তে ফার্স্ট ক্লাস থেকে নামতে শুরু করেছে। আমি পাশের স্লিপার কোচে টিটি'কে বললাম, 'সাতটা বার্থ চাই।' উনি বললেন, 'খালি আছে, উঠে পড়ুন।' আমি সবাইকে এক-একটা বার্থে বসিয়ে নিজেও বসেছি। টিটি বললেন, 'টিকিটগুলো দিন, বার্থগুলো কনফার্ম করে দিই।'

আমি বললাম, 'টিকিট তো নেই।'

'কী বলছেন?' টিটির চুল যেন খাড়া হয়ে গেল। 'এক্ষুনি নামুন। আজ মোবাইল চেকিং আছে। সব ভিজিলেন্সের অফিসাররা পাশের ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছে। আপনাদের জন্য কি আমি মারা পড়ব? নামুন, নামুন।'

আমি বললাম, 'নামা তো যাবে না। কাল মালদায় প্রোগ্রাম আছে। আপনি বরং টিকিট বানিয়ে দিন।'

উনি বললেন, 'এখন টিকিট বানাতে গেলে গার্ড সাহেবের সার্টিফিকেট লাগবে।'

আমি বেরলাম গার্ডের সার্টিফিকেট আনতে। ট্রেন প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। সার্টিফিকেটের কথা শুনে গার্ড তিরিক্ষে হয়ে বললেন, 'ইয়ারকি করতে এসেছেন? তিন ঘণ্টা দেরিতে গাড়ি ছাড়ছে। আর আপনি এখন এসে বলছেন সার্টিফিকেট দিন, টিকিট বানাতে পারিনি?'

সভাটা মূলত পথসভা ছিল, কিন্তু জায়গাটা জনবহুল। ফলে শুরু থেকেই শ্রোতার অভাব বোধ করতে হয়নি। এক-এক করে বলছেন— বীরেনদা, আনন্দদা, নুরুলদা, তারপর আমি। যে কোনও কারণে আমার বক্তৃতা সবচেয়ে তারিফ পেল।

আমি বললাম, 'না না, 'ডব্লিউ টি'তে যাব ভেবেছিলাম। এখন শুনছি মোবাইল চেকিং আছে। তাই আসতে হল।'

উনি বোধহয় আমার কাছ থেকে এতটা অনেস্ট কনফেশন আশা করেননি। আর কোনও কথা না বলে একটা সার্টিফিকেট বানিয়ে দিলেন। আমি এসে টিটি'কে দিয়ে দিলাম। উনি বললেন, 'এবার টিকিটগুলো বানান।'

আমি বললাম, 'আর টিকিট বানাব কেন? সার্টিফিকেট তো দিয়ে দিলাম। আপনি মোবাইল চেকিং এলে জানাবেন, আমি সার্টিফিকেট দেখে ওদের উঠতে দিয়েছি। তারপর ওরা টিকিট বানায়নি। বাকিটা আমরা বুঝব।'

'মশাই, এমন প্যাসেঞ্জার আমি আগে কখনও পাইনি। যা খুশি করুন।'

বলে টিটি মশাই গজগজ করতে করতে চলে গেলেন। আমরা নিশ্চিন্তে এক-একজন এক-একটা বার্থে লম্বা হয়ে ঘুম লাগালাম।

সকালবেলা মালদা আসবে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন বাইরে রোদ উঠে গিয়েছে, কিন্তু গাড়ি একটা অজ পাড়াগাঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জানা গেল, রাতে ইঞ্জিন ভেঙে গিয়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মোবাইল টিমও চলে গিয়েছে ফার্স্ট ক্লাস খালি করে। বদলি ইঞ্জিন এসে গাড়ি মালদা নিয়ে যাবে। বুঝলাম বিনা টিকিটে মালদা যাওয়া অত সহজ নয়। ইতিমধ্যে আনন্দদা নিচে নেমে শসা খেতে গিয়েছে। ফিরে এসে বলল, 'আমার পকেটমার হয়ে গেল।'

এহেন দুঃসংবাদে দেখলাম আমাদের চেয়েও টিটি বেশি চিন্তিত। তিনি বলে উঠলেন, 'এই অজ পাড়াগাঁয়ে কে পকেট মারবে? নিচে ভাল করে খুঁজে দেখুন, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।' বুঝলাম, উনি এটাকে আমাদের দিক থেকে কিছু না দেওয়ার ছুতো হিসেবে ভাবছেন। শেষ অবধি ইঞ্জিন এল। মালদা আসবে আসবে করছে। বেলা গড়িয়ে সন্ধে। মরিয়া হয়ে টিটি আমায় এসে বলল, 'আমাকে কিছুই দেবেন না?'

আমি এর-তার কাছ থেকে চেয়েচিন্তে ৩৫ টাকা ওঁকে দিয়ে বললাম, 'এই আছে।' উনি ব্যাজার মুখে টাকাটা নিলেন। আমি বললাম, 'মালদা স্টেশনে চেকার ধরলে বলব, আপনাকে টাকা দিয়েছি।' উনি রেগে গিয়ে বললেন, 'নিন আপনার ৩৫ টাকা। এর থেকে ওদেরও যদি ভাগ দিতে হয়, তবে না নেওয়াই ভাল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা বেরব কী করে?'

'আপনার মতো ধড়িবাজ বলছেন, কী করে বেরব? আমি লোক চিনি না?'

ক্ষোভে-দুঃখে জানিয়ে দিলেন তিনি। দেখলাম ওঁকে দাগা দিয়ে লাভ নেই। নিচে নেমে যা হয় একটা হবে। কিন্তু বারো ঘণ্টা লেটে ট্রেন আসাতে স্টেশনে চেকিং-এর কোনও বালাই ছিল না। আমরা বুলুর ঠিক করা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। বুলু বলল, 'ভাগ্যিস সভাটা সন্ধেবেলায় রেখেছি। চলুন, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে মিটিং শুরু করতে হবে।' সভাটা মূলত পথসভা ছিল, কিন্তু জায়গাটা জনবহুল। ফলে শুরু থেকেই শ্রোতার অভাব বোধ করতে হয়নি। এক-এক করে বলছেন— বীরেনদা, আনন্দদা, নুরুলদা, তারপর আমি। যে কোনও কারণে আমার বক্তৃতা সবচেয়ে তারিফ পেল। সোমেনদা বেঁচে গেলেন, কারণ উনিও উঠলেন আর বৃষ্টিও নামল।

এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। তখন আমার বক্তৃতায় মূল প্রতিপাদ্য ছিল, জরুরি অবস্থায় ইন্দিরাজি গণতন্ত্র হরণ করেছিলেন বলে যে অভিযোগ করা হয়ে থাকে, আমি তার সঙ্গে একমত হয়েই বলছি, এ অভিযোগ ঠিক। তবে তার গণতন্ত্র? হাজি মস্তান, সুকুর নারায়ণ বাখিয়া, ইউসুফ পটেলের গণতন্ত্র, যারা চোরাচালানে লিপ্ত ছিল। তাদের বিনা বিচারে ইন্দিরাজি হাজতে পুরেছিলেন। হাততালি নিয়ে নেমে আসার পর একজন রোগা লম্বা চেহারার প্রৌঢ় আমার সামনে এসে বললেন, 'ভালই তো বললেন, লোকে হাততালিও দিল। কিন্তু বলুন তো, আমি কোথাকার 'হাজি মস্তান' ছিলাম?'

আমার কিছু বোধগম্য হওয়ার আগেই বুলু বলল, 'চলুন মিঠুদা, তাড়াতাড়ি না গেলে হোটেলে খাবার পাওয়া যাবে না।'

রাস্তায় আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই ভদ্রলোক কে?' বুলু জানাল, উনি একটা স্থানীয় সাপ্তাহিকের সম্পাদক। বরকতদার নামে কয়েকবার সমালোচনা করে খবর ছাপার মূল্য হিসেবে 'মিসা' খেটে এসেছে।

জরুরি অবস্থার আর-একটা দিক আমার সামনে আচমকা উঠে এল।

(ক্রমশ)

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি
৯৪৩৪৩২৭৩৪২
শিবমন্দির
অনুপ দাস ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
বিশ্বনাথ বাগচি ৯৮৩২৬-৮৩৯৮৮
চালসা
দিলীপ সরকার ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল
৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায় ৯৯৩২৫৩৪৮৮৫
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৭৪৯৩৭৬৪৯৫
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড় ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি
৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার ৯৪৩৪৪২৩৫২২
বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

উত্তরঙ্গ তরঙ্গ

শোভা জানলার শিক ধরে বাইরের আকাশ দেখছিল। গোপাল ঘোষ ব্যর্থই হলেন। মঘা দেওয়ানির কথা শুনে যে লোকটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাঁর উদ্যোগেই পরদিন দেওয়ানির আস্তানায় পৌঁছেছিলেন গোপাল ঘোষ। অবশ্য সে আস্তানা কোনও গোপন কিছু নয়। আইন অমান্য আন্দোলনের কারণে তিনি ইংরেজদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন। আন্দোলন এখন স্তিমিত। তাই মঘা দেওয়ানকে লোকসমক্ষে দেখা যাচ্ছে। অবশ্য তিনি বাইরে বার হলেও ইংরেজরা যে তাঁর উপর জোর নজরদারি চালাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

গোপাল ঘোষের আলিপুরদুয়ারে আসার উদ্দেশ্য জানার পর মঘা দেওয়ান উপেনকে একবারেই চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু এর পর তিনি যেটা বললেন, সেটা শোনার পর গোপাল ঘোষ বুঝতে পেরেছিলেন যে উপেনের সন্ধান তিনি পাবেন না। 'ছেলেটাকে আমি চিনতাম।' বলেছিলেন মঘা দেওয়ান, 'আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কোথায় আছে তা বার করা খুব কঠিন হবে না। কিন্তু আপনি আমাকে এই অনুরোধ করবেন না। ওর খবর আপনাকে দেওয়াটা বিশ্বাসঘাতকতা হবে। আপনি যদি কোনও বার্তা দিতে চান, তবে তা আমি পৌঁছে দেব।'

বিফলমনোরথ হয়ে গোপাল ঘোষ বলেছিলেন, 'জলপাইগুড়িতে ওর পিসতুতো বোনের বিয়ে। পাত্র ওর পরিচিত। মাথাভাঙার গগনেন্দ্র মিত্র। বিয়ে শীঘ্রই।'

'এ বার্তা ওকে পৌঁছে দেব। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন মঘা দেওয়ান। এর পর দই, চিঁড়ে, কলা আর গুড় খেয়ে ফিরে এসেছিলেন গোপাল ঘোষ। এসেই জলপাইগুড়ি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে শুরু করেন। তিন দিন পর গতকাল দুপুর নাগাদ নিজের বাড়ির উঠোনে পা রাখেন।

ঘড়িতে সবে বিকেল পাঁচটা বেজেছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝপ করে অন্ধকার নেমে আসবে শহরের বুকে। পুরসভার কর্মী লম্বা লাঠির আগায় আগুন জ্বালিয়ে পথবাতি ধরাচ্ছিল। শোভা জানালা দিয়ে অলস চোখে দেখছিল সেই দৃশ্যটা। উপেনদাকে পাওয়া না গেলেও তার কাছে বিয়ের খবরটা পৌঁছে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়েছে জেনে একটু হলেও আশ্বস্ত হয়েছে সে। বাবা বলেছেন যে, উপেন যদি সত্যিই আসে, তবে তাকে আর ছাড়া হবে না। কিন্তু শোভা এটা শুনে খুব একটা আশান্বিত হয়নি। বিয়েতে এলে তাকে যে আর ছাড়া হবে

শোভা তাকিয়ে থাকল নীলিদির মুখের দিকে। হাত দুটো কোলের উপর রেখে আবার এসে বসেছে বিছানায়। লণ্ঠনটা তার মুখের কাছে। সুন্দর করে খোঁপা বেঁধেছে নীলিদি। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। শোভা সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে গুজরিয়ে ওঠে একটা অলৌকিক সম্ভাবনার কথা।

না, এটা কি উপেনদা অনুমান করবে না? শোভার বিশ্বাস যে, সে এলেও লুকিয়ে দেখা করে যাবে তার সঙ্গে। কিন্তু দেখা করতে এলে তাকে তো এ বাড়িতেই আসতে হবে। তখন শোভা চিৎকার করে বাড়ির লোককে ডাকবে না?

ঘরের ভিতরে অন্ধকার জমে গিয়েছে খানিক আগেই। সেটা দূর করার জন্য মা একটা বাহারি চিমনিওয়ালা লণ্ঠন দিয়ে গেলেন এইমাত্র। সেটা বিছানার উপরে রেখে নীলিদি মন দিয়ে একটা লেস লাগানো ব্লাউজ পর্যবেক্ষণ করছে। নীলিদি এ পাড়ায় থাকে। ওদের পরিবার ব্রাহ্ম। নীলিদিরা দুই বোন তাদের মায়ের সঙ্গে সেজেগুজে বাইরে বেরয়। বাড়িতে অর্গান বাজিয়ে গান গায়। নীলিদির মা রবি ঠাকুরকে একবার চিঠি লিখেছিলেন। রবি ঠাকুর সে চিঠির উত্তরও পাঠিয়েছিলেন। নীলিদি আর তার বোনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শোভার ছোটবেলা থেকে। কিন্তু বাবার ভয়ে হঠাৎ এক-আধ দিন টুকটাক দু'-একটা কথা ছাড়া শোভা আর বেশি এগতে পারেনি। কিন্তু বিয়ে ঠিক হওয়ার পর শোভা তার বাবার মধ্যে অনেকগুলি পরিবর্তন লক্ষ করছে। এর মধ্যে অন্যতম হল রবি ঠাকুর এবং ব্রাহ্মদের বিষয়ে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই কয়েকদিন আগে তিনি যখন নিজে থেকে শোভাকে বললেন, 'নীলির সঙ্গে তো তোর পরিচয় আছে। একবার কথা বলে দেখ না। মডার্ন সাজ সম্পর্কে ওদের তো বেশ আইডিয়া আছে।'

আসলে রবি ঠাকুর এবং ব্রাহ্মসমাজ নিয়ে গগনেন্দ্রর কোনও মাথাব্যথা নেই। ফলে বাবাকেও মাথা হালকা করতে হচ্ছে।

বাবার অনুমোদন পাওয়ার পর নীলিদি ঘন ঘন এ বাড়িতে আসছে। শোভা কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে টের পাচ্ছে যে, নীলিদিকে নিয়ে মায়ের আগ্রহটাও নেহাত মন্দ ছিল না। তাঁর মুখে 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে' শুনে আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মা ধরা গলায় বলেছে, 'রবি ঠাকুরের গান এটা? আহা! এমন শ্যামাসংগীত লিখেছেন উনি?'

নীলিদি বলতে চেয়েছিল যে গানটা ঠিক শ্যামাসংগীত নয়। কিন্তু মা মানেনি। উলটে প্রশ্ন করেছে, 'চরণধুলা তবে কার? মায়েরই তো? এমন আরেকটা শোনাও তো মা!'

নীলিদি তখন গেয়েছিল একটা ব্রহ্মসংগীত। সেই গানে মা কালীর চিহ্নমাত্র ছিল না, কিন্তু অরূপ ব্রহ্মকে শ্যামারূপে কল্পনা করে নিলে আটকাচ্ছে কে? ফলে সে দিন রাতে শোভা শুনল মা প্রসন্ন মুখে বাবাকে বলছে, 'নীলিটা ব্রাহ্ম। তবে ভাল ব্রাহ্ম। অরে কও শোভারে একটু ট্রেনিং দিয়া দিক।'

ব্লাউজ পর্যবেক্ষণ করে নীলিদি সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'বাবাকে বল দু'খানা পশমের ওভারকোট বানিয়ে দিতে। শীতের সময় শাড়ির উপরে পরে বরের সঙ্গে বার হবি। তোর গগনেন্দ্র আজ কী লিখল?'

মাথাভাঙা থেকে রোজ একটা করে চিঠি আসছে গগনেন্দ্রর। দীর্ঘ দীর্ঘ চিঠি। জবাবে অবশ্য শোভা এযাবৎ মোটে তিনটে চিঠি লিখেছে। চিঠিতে গগনেন্দ্র আশ্চর্য সব প্রস্তাব পাঠায় শোভাকে। তার এখন জলপাইগুড়িতে আসা বন্ধ। একেবারে বিয়ের দিন আসবে। উপেনের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করে দিন পাকা করা হয়নি এখনও। এবার সেটা করা হবে। মোটামুটি ঠিক হয়েছে যে, বৈশাখ মাসেই শুভকাজটা সম্পন্ন করে ফেলা হবে। আজকের চিঠিতে গগনেন্দ্র প্রস্তাব দিয়েছে, লুকিয়ে জলপাইগুড়িতে এসে শোভার সঙ্গে দেখা করবে ছদ্মবেশে। খুবই হাস্যকর প্রস্তাব। ছদ্মবেশে সে এ বাড়িতে ঢুকবে কী করে? ক'দিন আগে একটা চিঠিতে লিখেছিল, শোভা যদি কিং সাহেবের ঘাটে একদিন বিকেলে হাওয়া খেতে আসে, তবে গগনেন্দ্র সেখানে অপেক্ষা করবে। এটাও খুব অসম্ভব আর হাস্যকর। নীলিদির প্রতি বাবার বীতরাগ দূর হলেও তিনি শোভাকে বাইরে হাওয়া খেতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন— এটা সম্ভব নয়। শোভা নিজেও সেটা চায় না। কিন্তু গগনেন্দ্রকে থামায় কে?

নীলিদির প্রশ্নে শোভা তাই বিছানার কোনায় বসে বলে, 'ছদ্মবেশে দেখা করতে আসবে। এ বাড়িতে।'

নীলিদি খিলখিল করে হেসে বলে, 'বলিস কী! তোর বরের তো শৈশব কাটেনি দেখছি। অবশ্য তোকে পেলে কেটে যাবে।'

শোভা লাল হয়ে যায়। দু'হাতে মুখ ঢেকে বলে, 'ইশ্! কী যে বলো না তুমি!'

নীলিদি উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত ছড়িয়ে এক পাক ঘুরে গেয়ে ওঠে, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা।' তার গানের গলা সত্যিই ভাল। ইমন কল্যাণের ছোঁয়া লাগা সুরে সন্ধ্যার আবহাওয়া যেন পরিপূর্ণ হল। শোভা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনল সেই গান। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'এসব গান কোথাও পাও তুমি নীলিদি? কী অপূর্ব!'

'তোর বিয়েতে দেব, রবি ঠাকুরের গানের সংকলন।' নীলিদি হেসে জানায়। তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বলে, 'তোর উপেনদার খবর কিছু পেলি না, তা-ই না?'

'মনে হয় আসবে না।' একটু বিষণ্ণ হয়ে উত্তর দিল শোভা। উপেনদার পথটা যেন আলাদা হয়ে গিয়েছে। দেশের ছেলেরা অস্ত্র নিয়ে স্বাধীনতার কাজে নামুক— এটা গান্ধিজি চান না শুনেছি। রবি ঠাকুর চান?

'না রে।' নীলিদি আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়ে জবাব দেয়, 'তিনি কেন চাইবেন? সশস্ত্র আন্দোলন তিনিও সমর্থন করেন না। কিন্তু সবাই তো আর একমত হয় না রে শোভা! তুই ঠিক কথাটাই বললি। তোর উপেনদার পথ আলাদা হয়ে গিয়েছে।'

শোভা তাকিয়ে থাকল নীলিদির মুখের দিকে। হাত দুটো কোলের উপর রেখে আবার এসে বসেছে বিছানায়। লণ্ঠনটা তার মুখের কাছে। সুন্দর করে খোঁপা বেঁধেছে নীলিদি। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। শোভা সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে গুজরিয়ে ওঠে একটা অলৌকিক সম্ভাবনার কথা।

নীলিদির এখনও বিয়ে হয়নি। ব্রাহ্ম ঘরের মেয়েদের একটু দেরিতেই বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ। অবশ্য নীলিদির জন্য ব্রাহ্ম পরিবারের ভাল ছেলের অভাব হবে না। তার মতো ইংরেজি লিখতে-পড়তে শহরের ক'জন মেয়ে জানে? তার উপর সেলাই জানে, গান জানে, অর্গান বাজাতে পারে! সময় হলে নীলিদি হয়ত বিয়ে করে কলকাতায় চলে যাবে। কিন্তু কী ভালই না হত, যদি উপেনদার সঙ্গে বিয়ে হত নীলিদির।

শোভার বুক থেকে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। নীলিদি সেই নিঃশ্বাসের শব্দ টের পেয়ে হেসে বলে, 'বরের কথা ভাবছিস নাকি?'

শোভা লজ্জা পায় না। নীলিদির মুখ থেকে চোখ না সরিয়ে মৃদু হাসে কেবল।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্সের অসুররা আজ আর দুর্গাপূজার বিরোধী নয়

ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেমন, আলিপুরদুয়ার-২ নং ব্লকের মাঝেরডাবরি টি এস্টেট-এর শ্রমিক লাইন, মাঝেরডাবরি বস্তি, গয়েরকাটা, ফালাকাটা, কুমারগ্রাম ব্লকের শামুকতলা, বারোভিসা এবং কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমার হাজারাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পখিহাগা গ্রাম ও জামালদহে সংঘবদ্ধভাবে বাস করে অসুর জানজাতির মানুষ। এরা আদিম উপজাতি। মূলত ডুয়ার্সের চা বলয় গড়ে তোলার সময় ১৮ শতকের শেষে শ্রমিকের প্রয়োজন মেটাতে আসে বা আনা হয়। কিছু সময় আগেও এই অসুর জনজাতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা এমনকি এই সম্প্রদায়ের নিজস্ব মনোভাব ছিল কিছুটা পৌরাণিক। এক সময় এরা দুর্গা পুজো থেকে বিরত থাকত এবং পুজোর দিনগুলোতে ইচ্ছাকৃত ভাবেই নিজেদের গৃহবন্দি রাখতো দরজা জানালা বন্ধ করে, যাতে ঢাকের শব্দ বা ধুনোর গন্ধ না পৌঁছায়। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বংশ পরম্পরায় কুসংস্কারে আবদ্ধ থেকে ভাবতে শিখেছিল যে, তারা পৌরাণিক অসুরেরই বংশধর।

কিন্তু সময় পালটায়, সমাজ এগোয়, আর সেই সঙ্গে সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থানেও পরিবর্তন আসে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের ধারণায় পরিবর্তন এসেছে। সমান্তরাল সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদের গা ভাসিয়ে দিয়েছে। খুব কম সংখ্যকের মধ্যে হলেও শিক্ষার আলো এসে পৌঁছেছে। বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে, অন্যান্য জনজাতির সঙ্গে মেলামেশা বাড়ছে। ফলে পুরনো ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে তারা সক্ষম হয়েছে। আজ তারা জেনে গিয়েছে যে, তারা প্রাচীন পৌরাণিক অসুর নয়, এক বিশেষ জনজাতির প্রতিনিধি মাত্র এবং অন্যান্যদের মতোই সাধারণ মানুষ।

প্রসঙ্গত, এবারের শারদ উৎসবের দিনগুলোতে কলকাতার বুকে অসুর সমাজকে ঘিরে অবাঞ্ছিত বিতর্ক হয়। আর এর পিছনে ছিল পুজোর চমক ও থিম। ফুলবাগান সার্বজনীন পুজো কমিটি অসুর সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি সুষমা অসুরকে দিয়ে পুজোর উদ্বোধনের প্রচার চালায়। যদিও সুষমা সেখানে যাননি। এতে যথেষ্ট হইচইও হয়। সল্টলেকের এক দুর্গা পুজোয় অসুর সম্প্রদায় অনুষ্ঠান করে অসুর মূর্তি বসিয়ে। তারা মণ্ডপের বাইরে অসুর বন্দনা ও 'মাতাম' দেয়। কিন্তু কেউ ঘুরেও দুর্গার মুখদর্শন করেনি। এনডিটিভি সমস্ত অনুষ্ঠানের লাইভ কভারেজ দেয়। কলকাতার বুকে অসুর জনজাতির এই অনুষ্ঠানকে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলে দাবী করেছেন অনেকেই। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'আলামা ইন্টারন্যাশনাল' এর কর্মকর্তা সন্দীপন উদ্দীপন। তিনি সোসাল মিডিয়াতেও তার স্টেটাস দেন।

পুরনো ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে তারা সক্ষম হয়েছে। আজ তারা জেনে গিয়েছে যে, তারা প্রাচীন পৌরাণিক অসুর নয়, এক বিশেষ জনজাতির প্রতিনিধি মাত্র

শারদ উৎসব শেষ। অসুর বধ করে মা দুর্গা বিদায় নিয়েছেন। ডুয়ার্সের অসুরদের হালহকিকত, আকারপ্রকার জানতে হাজির হয়েছিলাম আলিপুরদুয়ার জেলার মাঝেরডাবরি টি এস্টেটের শ্রমিক লাইন ও মাঝেরডাবরির অসুর বস্তিতে। এই দুই জায়গাতে রয়েছে প্রায় ৪৫ ঘর অসুর জনজাতির মানুষ। শ্রমিক লাইনে ঢুকতেই প্রথমেই পেলাম চা বাগানের সরু পথ ধরে হেঁটে যাওয়া একজনকে। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লাম। পথ আটকে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'দাদা আপনার নাম কী? এখানেই থাকেন তো?' উত্তর এল 'ওমর অসুর, এখানে বস্তিতেই হামার বাস'। আপনার আমার মতোই দেখতে ওকে। গায়ের রং বেশ কালো, চোখেমুখে অপুষ্টির ছাপ। ওর সঙ্গে ওর বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে লোকজন থাকলেও ইশারায় কাউকে বের হতে বারণ করে দিল, আর আমাদের

জানিয়ে দিল সবাই বাইরে কাজে গিয়েছে। তারপর ওমর নিজেও উধাও। ঘন্টাখানেক অপেক্ষার পর সে দেখা দিল। তারপর ওমন অসুরই সমস্ত বস্তি ও লাইন ঘোরালো আমাদের। প্রথমে কথা বলতে না চাইলেও একটু সময় দিতেই সবাই এক এক করে এগিয়ে আসেন, কথা বলেন 'ছবি'র জন্য বেশ 'পোজ'ও দেন দলবেঁধে। তবে বেশ খানিকটা, বলা ভাল প্রায় একবেলা সময় লেগেছে এই সখ্যতা গড়ে তুলতে। দুপুর পেরিয়ে শেষ বিকেলে আমি ও আমার দুই সঙ্গীকে নিয়ে বস্তির কচিকাঁচাদের সঙ্গে বেশ মেতে উঠি।

অসুর বস্তিতে মানুষ ও শুয়োর— গৃহপালিত পশুর সহাবস্থান। প্রত্যেকেরই একটি করে ঘর, ওতেই থাকা রান্নাবান্না। কারোর বাড়ির কোনও সীমানা নেই। ইতিউতি ছুটে বেড়াচ্ছে কচিকাঁচারা। বড়রা বেশিরভাগই চা-পাতা তুলতে গিয়েছে। আবার কেউ বা বক্সা বাঘবনের রাজাভাতখাওয়া অঞ্চলে শুকনো কাঠ কাটতে গিয়েছে। বাড়ির মেয়েরা ঘর সামলাচ্ছে। বয়স্করা, যারা একটু অশক্ত তারা কেউ বা বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করছে, কেউ বা নদী থেকে গুগলি এনে রান্না বা খাবার উপযুক্ত করে তুলছে। যেমন মংগু অসুর দাওয়ায় বসে গুগলি বাছছে। তার স্ত্রী বিশ্বা অসুর ঘরে পাতা লক্ষ্মী পুজো দিতে ব্যস্ত। তাদের ছেলে বছর তিরিশের কল্যাণ অসুর অবশ্য অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের আগমনে বেশ বিরক্ত। সে পেশায় ট্রাকের খালাসি। ওর উদ্দেশ্যে ধীরেসুস্থে প্রশ্ন ছুঁড়েছিলাম, 'আপনারা তো হিন্দু, সব পুজো করেন'? উত্তর আসে— 'হ্যাঁ'। 'ক'দিন আগে তো দুর্গাপুজো গেল, গিয়েছিলেন দেখতে?' চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল কল্যাণ, বলে— 'ওটাতো কিলাবের পুজা ছিল, যারা যাওয়ার গেছিল, না যাবার কী আছে? হামার সময় হয়নি'। কল্যাণের কথায় উপস্থিত সকলেই হতচকিত হয়ে পরি। সামলে দেন ওর মা বিশ্বা অসুর। বলেন, 'হামরা কিন্তু ঐ অসুর নাই আছি। হামরা দুর্গাপুজোয় সব্বাই যাইছি'। অর্থাৎ সমাজে মিশে গিয়েছেন অসুর জনজাতির মানুষ। সাবেক ধারণা থেকে আজ তারা বহু যোজন দূরে। তবে এটা ঠিক দুর্গাপুজো নিয়ে উত্তর দিতে গিয়ে তাদের অনেকের মধ্যেই বিরক্তি ও আড়ষ্টতা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

আরেকটি বস্তিতে যেতেই দেখলাম যে, এক গৃহবধু একমনে কুলো থেকে ঝুড়িতে কিছু একটা বেছে বেছে রাখছে। এগিয়ে যেতেই দেখা গেল সে চা-পাতার ফুল বাছছে। প্রশ্ন করেছিলাম, 'এগুলো দিয়ে কী করবেন'? লাজুক বধুর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বলে

ওদের প্রিয় খাদ্য বলতে চা-পাতার ফুল। সত্যিই নিদারুণ করুণ অবস্থা ডুয়ার্সের এই অসুর জনজাতির মানুষের। এখনও সবাই বিপিএল কার্ড পায়নি।

দেয় 'তরকারি বানাবো, বাচ্চাগুলান খুব ভালবাসে গো'। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সেলিনা অসুর। আবার লোকজন, ক্যামেরা দেখে ঢুকেও যায়। অনেক আবেদন নিবেদন শেষে অবশেষে দর্শন মেলে। জিজ্ঞেস করলাম, 'পড়াশোনা করো'? উত্তর, 'আধা পড়ছি, কেলাস ফাইভ, আর পয়সা হয় নাই'।

সত্যিই নিদারুণ করুণ অবস্থা ডুয়ার্সের এই অসুর জনজাতির মানুষের। এখনও সবাই বিপিএল কার্ড পায়নি। কেউ কেউ ইন্দিরা আবাসের ঘর অবশ্য পেয়েছেন। পরিবারের সবার ঠাঁই হয় না তাতে। তাই অধিকাংশের বাস ঝুপরিতেই। নেই নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল, রাস্তা, কর্মসংস্থান। দু-চারজন হাতে গোনা যাদের সন্তানরা সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত। যেমন অমৃত অসুর বিএসএফ জওয়ান। বিশ্রাম অসুর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষার মাধ্যমে এমএ পাশ করে শহরে থেকে টিউশন পড়ায়। কিন্তু বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সরকারি সাহায্যের অপ্রতুলতা চা-বাগান কর্তৃপক্ষের অমানবিকতায় এদের নানা ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে।

কোচবিহারের মাথাভাঙার পখিহাগায় নয় ঘর অসুর রয়েছেন। সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা এই গ্রামে জনা তিরিশ। এখানকার কেউই সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন না দীর্ঘদিন। সুভাষ অসুর শেষ পর্যন্ত মুখ খোলেন। বলেন, 'আমরা দুর্গার ঐ অসুর না। আমাদের পূর্বপুরুষরা কী বিশ্বাস করত বা করত না তা আমরা জানি না। আমরা যেখানে থাকি সেখানকার সমাজই আমাদের সমাজ'। এখানকার একজন মেয়ে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, নাম সেবন্তি অসুর।

অসুর জনজাতির প্রকৃত উৎস ঘাঁটলে দেখা যাবে অন্য এক বাস্তব। আলিপুরদুয়ার জেলা জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি তথা বরিষ্ঠ সাহিত্যিক ও গবেষক রমেন দে এ সম্পর্কে জানালেন, 'প্রায় ৬০০ বছর আগে প্রাক্ জ্যোতিষপুর অর্থাৎ আজকের যেটা আসাম সেখানকার রাজা ছিলেন নরকাসুর ও ঘটকাসুর। এদের বংশধররাই অসুর বলে পরিচিত। আসাম থেকে ডুয়ার্স পর্যন্ত এলাকাকে তখন বলা হত কিরাত। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য ঋকবেদেও 'অসুর'-এর উল্লেখ আছে। উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে আর্যরা অনার্যদের পরাস্থ করে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের অনার্যদের তারা আখ্যা দেন 'অসুর' বলে।

যাইহোক, ডুয়ার্সের অসুররা মূলত হিন্দু এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর। অবশ্য অল্প সংখ্যায় খ্রিস্টানও আছে। ডুয়ার্সের আদিবাসীরা মূলত দুই ধরনের— 'হোয়াইট ট্রাইবাল' বা 'মঙ্গোলিয়' এবং 'ব্ল্যাক ট্রাইবাল' বা 'দ্রাবিড়'। প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হল— গারো, রাভা, ডুকপা, ভুটিয়া, লেপচা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হল— অসুর, ওঁরাও, মুন্ডা, ভিল ইত্যাদি। অর্থাৎ ডুয়ার্সের অসুররা আদিবাসী উপজাতির। এরা কোনও পৌরাণিক চরিত্রের ধারক বা বাহক নন। আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। কিন্তু চূড়ান্তভাবে পিছিয়ে পড়া। প্রয়োজন সরকারি সাহায্যের, বাসযোগ্য পরিবেশের, শিক্ষার। আর তাহলেই যেটুকু কুসংস্কার এদের সম্পর্কে বেশ কিছু সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং অসুর সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যকের মধ্যে আজও বর্তমান, তা দূর হবে। তবেই ঘুচে যাবে সমাজের সব ব্যবধান।

দিব্যেন্দু ভৌমিক

ছবি: প্রতিবেদক

বই পত্রের ডুয়ার্স

ছোট ছোট কথা

‘আমার কথা আমার লেখা’ একটি ৪৮ পাতার ক্ষুদ্র গ্রন্থ বা পুস্তিকা। লেখিকার পিতৃদত্ত নাম রেবা নন্দী। দশম শ্রেণিতে পড়াকালীন তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। নাম বদলে হয় কবিতা পাল। পুস্তিকাটির অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি তিনি এই নামেই লিখেছেন। যৌথ পরিবারের বড় বউ হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার পর জীবনসায়াহ্নে এসে টুকরো টুকরো গদ্য লিখতে শুরু করেছিলেন। পুস্তিকায় স্থানপ্রাপ্ত রচনাগুলি ২০০৯ থেকে ২০১১-র মধ্যে লিখিত। লেখাগুলি

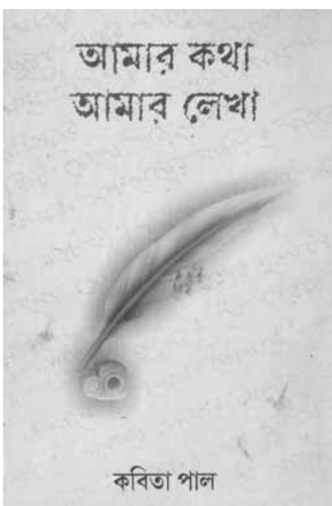

‘ব্যক্তিগত গদ্য’, ‘ভ্রমণ’ এবং ‘অন্যান্য’— মোট তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত।

প্রথম পর্যায়ের রচনাগুলিতে লেখিকার ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি মুখ্যত ধরা পড়েছে। শৈশব এবং কৈশোরের বেশ কিছু সময় তিনি কাটিয়েছিলেন সামসিং চা-বাগানে। উক্ত বাগানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। প্রথম জীবনের স্মৃতির পাতা উলটিয়ে তিনি উদ্ধার করে এনেছেন প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগের সামসিং বাগানের আনন্দমুখর দিনগুলির কথা। লেখিকার জন্মবছর জনা গেলে সময়কালটি আরও নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যেত। তিস্তাপাড়ের মেখলিগঞ্জেও কেটেছে শৈশবের একটা অংশ। সেই জনপদের পুরনো কথাও আছে।

লেখিকার আটপৌরে গদ্যের কারণে ‘ব্যক্তিগত স্মৃতি’র তালিকায় থাকা রচনাগুলি বেশ সুখপাঠ্য। যেমন ‘বৃষ্টির খবর আমরা অনেক আগেই পেতাম— কেমন করে? বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম সামনের পাহাড় একটা সাদা ওড়নায় ঢেকে গেল, তারপরেই জঙ্গলে তুমুল বৃষ্টির আওয়াজ।’ অন্তত পাঁচটি রচনায় লেখিকা নিজের ছোটবেলার কাহিনি শুনিয়েছেন। মেখলিগঞ্জ পর্বে স্মৃতি আছে আরও দু’টিতে। পড়ার পর একটু আক্ষেপ হল এই ভেবে যে, প্রতিটি রচনাই ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট। ‘শিকার খেলা’ নামে মেখলিগঞ্জ পর্বের লেখাটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

ভ্রমণ পর্বে রয়েছে সাতটি ছোট রচনা। ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত উপলব্ধি মিলিয়ে-মিশিয়ে লেখা। পড়তে ভালই লাগে। হয়ত বয়সের ভারে বিস্তৃতভাবে লিখে উঠতে পারেননি, তবুও গঙ্গাসাগর কিংবা তালসারি ভ্রমণের কাহিনিতে তাঁর স্মৃতি বেশ অটুট মনে হয়েছে। ‘শংকর-নর্মদা’ শীর্ষক রচনাটি অবশ্য উক্ত অঞ্চল সম্পর্কে প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যানের পুনর্লিখন।

‘অন্যান্য’ পর্যায়ে আছে একটি কবিতা এবং একটি কয়েক লাইনের গদ্য। বিষয় বাইশে শ্রাবণ।

পুস্তিকার সূচনায় ‘প্রসঙ্গ কথা’ লিখেছেন লেখিকা-কন্যা তনুশ্রী পাল। পুস্তিকাটিকে বলা হয়েছে ‘প্রথম খণ্ড’। অর্থাৎ আরও অন্তত একটি খণ্ড ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। সেই খণ্ডে চা-বাগান এবং মেখলিগঞ্জের স্মৃতি নিয়ে আরও কিছু রচনা পাওয়া গেলে মন্দ হবে না। এই ধরনের রচনায় ডুয়ার্সের পুরনো সামাজিক জীবনের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়, তথাপি এই ধরনের রচনা খুব বেশি পাওয়া যায় না। হয়ত আর সম্ভব নয়, কিন্তু কবিতা পাল যদি তাঁর আটপৌরে গদ্যে শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিকে আশ্রয় করে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করতেন, তবে তা আমার মতো পাঠকের কাছে বিশেষ আহ্লাদের ব্যাপার হত।

আমার লেখা আমার কথা। কবিতা পাল।
তিস্তা নন্দিনী সাহিত্য পাঠচক্র।
জলপাইগুড়ি। চল্লিশ টাকা।

প্রবীর গোস্বামী

‘রসিক বিল’ একটি পত্রিকাও

এটা ভেবেও ভাল লাগে যে, কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের মতো প্রান্তিক এলাকা থেকে ১১ বছর ধরে ‘রসিক বিল’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এই বছরের শারদীয় সংখ্যাটি তাদের ১৪তম সংখ্যা। ৮৪ পাতার পত্রিকায় স্থান পেয়েছে প্রায় একশোটি কবিতা, ছ’টি প্রবন্ধ, তিনটি ভ্রমণ কাহিনি, দু’টি ছোটগল্প। এ ছাড়া রয়েছে অণুগল্প ইত্যাদি। রয়েছে নীরদ রায়ের সাক্ষাৎকারের অংশ এবং সুজিত অধিকারীর অপ্রকাশিত কবিতা ও কোচবিহারের প্রাচীন

ঐতিহ্য বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ।

পত্রিকার শক্তিশালী অংশ অবশ্য প্রবন্ধগুলি। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রসঙ্গ টেনে আনন্দগোপাল ঘোষ উল্লেখ করেছেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং প্রেমহরি বর্মনের কথা। ‘ধীরেন্দ্রনাথ গণপরিষদের প্রথম সদস্য যিনি ভাষার প্রশ্নে গণপরিষদের অধিবেশনেই সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। সেই সংশোধনী প্রস্তাবে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে সমান মর্যাদা দেওয়া হোক।’ এই প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির টিকিটে নির্বাচিত সদস্য প্রেমহরি বর্মন। প্রেমহরি দিনাজপুর থেকে প্রতিনিধিত্ব করতেন। যদিও তাঁদের প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। আনন্দগোপালের প্রবন্ধটি পত্রিকার একটি মূল্যবান সংগ্রহ। উমাপদ রক্ষিতের ‘জাতিভেদ প্রথা ও ভারতবর্ষ’ একটি দরকারি লেখা। একদা ‘চাকরি’ ছিল শূদ্রের জীবিকা। লেখক সকৌতুকে লক্ষ করেছেন যে, ‘শূদ্রের সেই পেশা চাকরি আজ উন্নততর সকল জাতির কাছে সম্ভবত সর্বাধিক প্রিয় নেশা।’ জাতিভেদে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী— উভয় পক্ষই লেখাটি পড়তে পারেন।

অন্য দিকে, কোচবিহার রাজপরিবার তাঁদের ভূখণ্ডে হিন্দুধর্ম বিকাশে উদ্যোগ নিয়েছিলেন কি না, সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন দেবব্রত চাকী। একটি দীর্ঘ রচনার প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়েছে, যা মূল রচনাটি

বিষয়ে আগ্রহ জাগায়। কোচবিহারে লুপ্তপ্রায় 'ইনডোর গেম'-এর একটি হল 'মোগল-পাঠান খেলা'। এই আকর্ষণীয় বিষয় নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখেছেন দিলীপকুমার দে। কোচবিহার পর্যায়ে প্রদীপ ঝা এবং মিনতি সমাদ্দার বাগচীর লেখা দু'টিও উল্লেখযোগ্য। ক্ষিতেন্দ্রমোহন সরকারের ব্যর্থ প্রেমের আখ্যানটি রাজবংশী ভাষায় রচিত।

কবিতাংশে অনেক অখ্যাত, নবীন নামের সন্ধান পাওয়া গেল। প্রয়াত সুজিত অধিকারীর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এই অংশে। কবিতাপ্রেমী পাঠকরা সবাই সুজিতবাবুর লেখা পড়েছেন কি? সন্দেহ নেই যে সুজিতবাবু শক্তিমান কবি ছিলেন। সদ্যপ্রয়াত নীর রায়কেও স্মরণ করা হয়েছে।

গল্প ও অণুগল্পগুলি যে উচ্চস্তরের হয়েছে তা বলতে পারছি না। শ্যামল সরকারের গল্পটি অপেক্ষাকৃত ভাল লাগল। সম্পাদকের ছোটগল্পটিও মন্দ হয়নি। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, 'যতদিন সুস্থ আছি, ভাল আছি, রসিক বিল বার হবেই।' এ ভারী আনন্দের কথা। তবে জায়গা বাঁচাতে গিয়ে ছাপার অক্ষর কখনও কখনও অতি ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে। এটা পীড়াদায়ক। পত্রিকাটি আর-একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রকাশ করা যেত। তবে, আলোচ্য সংখ্যায় শতাধিক লেখককে জড়ো করতে পেরেছেন সম্পাদক। আগামীতে এই সংখ্যা নিশ্চিত বাড়বে। ফলে সুসম্পাদিত ও গুণমানে উন্নত পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি কঠোর হতে বাধ্য হবেন। আর 'রসিক বিল' নামের পত্রিকায় এক-আধটা সরস রচনা কি থাকতে পারে না?

রসিক বিল। শারদ ২০১৬।
সম্পাদক- হরিদাস পাল। তুফান গঞ্জ।
কোচবিহার। চল্লিশ টাকা।

রজত অধিকারী

আপনি কি 'এখন ডুয়ার্স'-এ লিখতে চান?

আপনিও হতে পারেন 'এখন ডুয়ার্স'-এর প্রতিবেদক। আপনার এলাকায় কোনও উৎসব, অনুষ্ঠান, মেলা হলে তা-ই নিয়ে প্রতিবেদন লিখে পাঠাতে পারেন। প্রতিবেদনটি যেন ২৫০ শব্দের মধ্যে হয়। সঙ্গে ছবি দিতে ভুলবেন না। লেখা পাঠান **'এখন ডুয়ার্স', মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১। ই-মেল- ekhonduars @gmail.com**

শংসাপত্র প্রদান ও ভোটের নাটক

কোচবিহার ছায়ানীড়-এর উদ্যোগে এবং কলকাতার অ্যাসোসিয়েশন অব ভলান্টারি ব্লাড ডোনারস, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর পরিচালনায় 'সমাজসেবা রক্তদাতা উদবুদ্ধ করুন ও সংগ্রহ' বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্সের সফল শিক্ষার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হল।

গত ৬ নভেম্বর স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই শংসাপত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত, আবৃত্তি এবং ছায়ানীড় প্রযোজিত, দেবব্রত আচার্য রচিত ও স্বাগত পাল পরিচালিত নাটক 'ভোট পরিষেবা' মঞ্চস্থ করা হয়। অনুষ্ঠানে এভিবিডি-র প্রতিনিধি পার্থ মণ্ডল, কোচবিহার এসডিও অফিসের প্রতিনিধি মৃদুলকান্তি অঞ্জয়, সমাজকর্মী রাধেশ্যাম দত্ত, নাট্যকর্মী বিদ্যুৎ পাল এবং হরেন চন্দ্র বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক নির্মল দে উপস্থিত ছিলেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

'এখন ডুয়ার্স' আয়োজিত বিজয়ার মিলন অনুষ্ঠান আড্ডায়-সুরে-ছন্দে

গত ২২ অক্টোবর, ২০১৬ 'এখন ডুয়ার্স' তার নিজস্ব পত্রিকা অফিস তথা জলশহরের আড্ডাপীঠ 'আড্ডাঘর'-এ আয়োজন করল বিজয়ার মিলন উৎসবের। গানে গানে ভরে উঠেছিল ঘর। জেলার বিশিষ্ট মানুষদের উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ এই অনুষ্ঠানে বৈঠকি আঙ্গিকে পরিবেশিত হয় বাংলা আধুনিক গান। অনুষ্ঠান শুরু হয় গ্রন্থন সেনগুপ্তর কণ্ঠে বাংলা ব্যান্ডের আদি গানগুলির ব্যঞ্জনায়। এর পর সংগীত পরিবেশন করেন শৈবাল বসু ও মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস। পুজোর হিন্দি গান গেয়ে অনুষ্ঠানে অন্য পরিবেশ এনে দেন কবি প্রবীর রায়। কথায় কথায় পুজো ও আড্ডার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আড্ডার মেজাজটি বজায় রাখেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, প্রশান্তনাথ চৌধুরী, পার্থসারথি লাহিড়ি, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্যকমল বণিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সত্যম ভট্টাচার্য, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ফোক ব্যান্ড 'ফাইভ স্ট্রিংস'-এর পরিবেশনা। বিতান শিকদারের কণ্ঠে ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকগান অনুষ্ঠানটিকে একেবারে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়। একাদশ শ্রেণির ছাত্র অঙ্কুর ও স্বরূপ মালাকারের গান দিয়ে সংগীত সন্ধ্যার সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানের শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 'এখন ডুয়ার্স'-এর তরফে শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। সমস্ত অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন সুপ্রিয় চন্দ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আজও জন্মদিনে পুরনো ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছায় ভরে ওঠে ইনবক্স ও মন

হয়ত বা অন্বেষা একটু স্ট্যামার করত বলেই কথা বলতে চাইত না। অথবা কথা বলত না বলেই ওর তোতলামিটা বন্ধ হচ্ছিল না। যেটাই হোক, ওর কথা না-বলাটাই ওর একটা সমস্যার কারণ ছিল, বিশেষত ওর বাবা-মায়ের কাছে। মধুমিতা ভট্টাচার্য তখন ওই স্কুলের শিক্ষিকা। লক্ষ করলেন, তাঁর ক্লাসের একটি বাচ্চা বড্ড একলা, কারও সঙ্গে খেলে না, কোনও বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে না, মেশে না। উনি ডেকে কথা বলতে চাইলে আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেন যে, কোথাও ওর একটা গভীর সমস্যা রয়েছে। সেই স্কুলের নিয়ম ছিল, টিচাররা নিজের নিজের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একসঙ্গে বসে টিফিন খাবেন। তিনিও তা-ই খেতেন। এবারে করলেন কী, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্বেষার সঙ্গে ভাব জমাতে শুরু করলেন। টিফিন শেয়ার করলেন, গল্প করলেন, আদর করতে লাগলেন, ভালবাসতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল, একটু একটু করে ও কথা বলতে এবং ম্যাডামের উপর নির্ভর করতে শুরু করল। হয়ত বা বুঝতে পারল, ইনিই একমাত্র, যিনি ওকে বুঝতে পেরেছেন। ওর মা-ও সন্তানের এমন পরিবর্তনে খুবই আনন্দিত। কিছুদিন পর অন্বেষা এতটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠল যে, স্কুলের অনুষ্ঠানে দলবদ্ধ নাচে অংশগ্রহণ করল। খুব ভাল নাচল। তা-ই দেখে ওর মা তো অবাক, 'এ কী অসাধ্যসাধন করেছেন আপনি!' ওই স্কুল ছেড়েছেন বেশ কয়েক বছর হল, তবুও এখনও খবর নেন অন্বেষার। ভাল আছে। এক্কেবারেই স্বাভাবিক। সুন্দর কথা বলে, সকলের সঙ্গে মেশে, একটা স্বাভাবিক মেয়ের মতোই। 'এটা যে কত বড় পাওয়া, আমি জীবন দিয়ে তার তৃপ্তি অনুভব করতে পারি।'

এই স্কুলে থাকার সময়ই আর-একটি ঘটনা ওঁকে নাড়া দিয়েছিল খুব বেশি করে। সে দিন ছিল রাখিপূর্ণিমা। ক্লাস ফাইভের ক্লাস টিচার উনি। ক্লাসে গিয়ে দেখলেন ছেলেমেয়েরা একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে দিচ্ছে। নিজেও সে দিন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে উপহার পেয়েছেন বেশ কিছু রাখি। খানিকক্ষণ ক্লাসে থাকার পর উনি লক্ষ করলেন, একটি মুসলিম মেয়ের হাতে একটিও রাখি নেই, কেউ তাকে পরায়নি। এর কারণ অবশ্য কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু মাতৃস্থানীয়া শিক্ষিকার চোখ এড়াল না যে মেয়েটি কাঁদছে। এগিয়ে গেলেন ওর কাছে। মমতার স্পর্শ দিয়ে আদর মাখিয়ে ওর সঙ্গে খোলাখুলি কথা বললেন। মেয়েটি জানাল, তাকে কেউ রাখি পরায়নি বলেই মন খারাপ তার। মধুমিতা ম্যাডাম নিজের হাতে বাঁধা রাখি খুলে সস্নেহে পরিয়ে দিলেন ওর হাতে। হাসল মেয়েটি। পরে এই ব্যাপারটি নিয়ে অনেক ভেবেছেন, কী কারণ থাকতে পারে ওইটুকু কিশোর-কিশোরীদের চিন্তাধারার মধ্যে, যার ফলে ওই মেয়েটিই একমাত্র রাখি

মধুমিতা ভট্টাচার্য

পরার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল? ভেবে পাননি, ভাবার চেষ্টাও করেননি, পাছে বড় কোনও মন খারাপের বিষয় বেরিয়ে আসে।

যে দিন ওই স্কুল ছেড়ে চলে যাবেন, তার আগের দিন কোনও একজন ছাত্রীকে কথার কথা বলে ফেলেছেন যে, আগামীকাল থেকে তিনি আর স্কুলে আসবেন না। সে গিয়ে সকলকে বলে দিয়েছে। ওই দু'টি মেয়ে (অন্বেষা এবং মুসলিম মেয়েটি) এসে তাদের প্রিয় শিক্ষিকাকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে সে কী কান্না। 'মিস, তুমি যাবে না, তুমি কিছুতেই যাবে না।' তখন মনের ভিতর থেকে প্রশ্ন উঠে আসছিল মধুমিতার, 'এটা কি আমি ঠিক করছি, আমার এদের ছেড়ে যাওয়াটা কি উচিত হচ্ছে?' সেই মুহূর্তের কণ্ঠ রোধ করা অবস্থা থেকে খানিকক্ষণ সময় লাগল বাস্তবের মাটিতে পা রাখতে। নিজেকে ধাতস্থ করে নিয়ে ওদের সান্ত্বনা দিলেন বটে, কিন্তু বাকি জীবনে কোনওভাবেই ভুলতে পারবেন না এইসব অমূল্য ভালবাসার কথা। এরকম শিশু-কিশোরদের নিয়ে সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতা আরও অনেক হয়েছে শিক্ষিকা হিসেবে। এবং সঠিক দিশা দেখিয়ে দিতে গিয়ে সাফল্যও পেয়েছেন প্রতিটা ক্ষেত্রে। এগুলোই পরম পাওয়া বলে মনে করেন মধুমিতা। স্কুলের কাজ মন দিয়ে করার পর অবসর কাটান লেখালেখি করে, ছবি এঁকে, গানবাজনা নিয়ে, এমনকি হাতের কাজ করেও। আসানসোলের ঊষারানি গড়াই বিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর শান্তিনিকেতনে উদ্ভিদবিদ্যায় সাম্মানিকসহ স্নাতক এবং প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিবাহ-পরবর্তী জীবন শুরু করেন শিলিগুড়িতে। পরে ইউজিসি-র ফেলোশিপ পেয়ে পিএইচ.ডি.-ও করেন তিনি। এর পর স্বামীর কর্মসূত্রে পাড়ি দেন আসামে। আসামের বিভিন্ন চা-বাগানে কাটে অনেকগুলো বছর। এখানে থাকাকালীন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এর অধীনে ক্যানসার নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত হন তিনি। কিন্তু স্বামীর চাকরি বদলের সঙ্গে সঙ্গে স্থান বদলের ফলে এই গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ করা গেল না। সেদিক থেকে ছোট্ট একটা আপশোস থাকলেও কোথাও কখনও কাজ ছাড়া বসে থাকেননি বলে তৃপ্তও বটে।

আসাম থেকে ডুয়ার্সের চা-বাগানে এসেও কোনও না কোনও স্কুলে শিক্ষিকার কাজ করেই গিয়েছেন যত্নের সঙ্গে। কখনও বা প্রিন্সিপালের পদ সামলেছেন দায়িত্বের সঙ্গে। বারে বারে কষ্ট পেয়েছেন স্কুল

পালটানোর সময়গুলোতে। সাময়িক বিচ্ছেদ হলেও ছাত্রছাত্রীদের ভালবাসা থেকে মুখ ফেরাতে পারেননি আজও। তারাও ভোলেনি তাদের প্রিয় শিক্ষিকাকে। তাই এখনও জন্মদিনে ভূরি ভূরি এসএমএস আর ফোনে ভরপুর হয়ে যায় মধুমিতার মন। তিনিও খবর নেন তাঁর ছেলেমেয়েদের। একজন শিক্ষিকা হিসেবে এটাই চরম পাওয়া। আদর্শ শিক্ষক বা শিক্ষিকা বোধহয় তিনিই, যিনি মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকেন তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ভালবাসা আর শ্রদ্ধার মধ্যে। দুঃখের বিষয়, এমনটা আজকাল বড়ই কম। সেদিক থেকে মধুমিতা ভট্টাচার্য অনন্যা।

লেখালেখির প্রতি ভীষণ আকর্ষণ আছে মধুমিতা ভট্টাচার্যর। যথেষ্ট মন দেন সেদিকেও। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন নামী পত্রপত্রিকায় নিয়মিত গল্প-কবিতা বেরয় তাঁর। লিখছেন অনলাইন ম্যাগাজিনেও। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি এত যে টান অনুভব করেন, তার নেপথ্যে পারিবারিক অনুপ্রেরণা আছে নিশ্চয়ই। জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'কাকু ছিলেন ছয়ের দশকের স্বনামধন্য গণসংগীতশিল্পী সাধন দাশগুপ্ত। তিনি খুবই বন্ধু ছিলেন সলিল চৌধুরী, নির্মলেন্দু চৌধুরী— এঁদের। তাঁরা একসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় গান-থিয়েটার ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিতেন।' এমন কাকুর কাছ থেকেই তাঁর সংস্কৃতিমনস্ক হয়ে গড়ে ওঠা।

নিজে যে চা-বাগানে থাকেন, সেখানকার দুর্গা পুজোর দায়িত্ব নিয়ে সবাইকে এক পরিবারের মতো ধরে রেখে এক অন্য পরিবেশে পৌঁছে দেন তিনি। স্কুলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে নিজে গান লিখে তাতে সুর দিতেন অবলীলায়। এসব ছাড়াও সংসারী মধুমিতার কথা না বললে অপূর্ণ থেকে যাবে লেখাটি। মা হিসেবে দায়িত্বপালনেও ত্রুটি রাখেননি তিনি। দুই যমজ ছেলেকে মানুষ করেছেন। তাঁরা এখন প্রতিষ্ঠিত। শখের বাগানে ফুল ফুটিয়েছেন এমনই যে পুরস্কার পেয়েছেন ফ্লাওয়ার শো-তে। গান গেয়েছেন নিষ্ঠার সঙ্গে, ফলে সেখানেও পুরস্কার। বাদ যায়নি রান্নাবান্নাও। যে চুল বাঁধে, সে রাঁধেও— উলটে বললেও কথাটি সত্য। রান্নার প্রতি তাঁর এমনই তীব্র ঝোঁক যে, নানান ঝক্কির কাজ সামলাবার পরও রাঁধুনি হিসেবে পুরস্কার জিতেছেন নানান জায়গায়। এ-ও কি কম কথা? দশভুজা বোধহয় এঁদেরই বলে। এমন একজন শ্রীমতীর জন্য রইল 'এখন ডুয়ার্স'-এর পক্ষ থেকে শুভকামনা।

শ্বেতা সরখেল

বৈবাহিক সম্পর্ক ভাঙলেই প্রেম নিঃশেষ হয়ে যায় না

জীবন ক্ষণস্থায়ী, তাই একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজন মানুষের সম্পর্ক সবসময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কখনও বা একজন নারী ও একজন পুরুষের মধুর সম্পর্কও ভেঙে যায়। কখনও নিজেদের কারণে, কখনও বা পারিপার্শ্বিক কারণে। মেয়েরা সম্পর্ক ভেঙে গেলে কাঁদে, কষ্ট পায়। কখনও বা এই অবসাদ সারাটা জীবন ধরে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হয় অন্যরকম। সম্পর্ক ভাঙলে, দুঃখকে অসহ্য মনে হলে কেউ কেউ হিংস্র আচরণ করে, কেউ বা অস্বাভাবিক জীবনযাপন করে। এর কারণ হিসেবে গবেষকরা ও মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন যে, একটি ছেলে ও মেয়ের বয়ঃসন্ধিকালে তৈরি হয়ে যাওয়া ভিন্ন মানসিক গঠন এর জন্য দায়ী। একটি মেয়ে বয়ঃসন্ধিকালে অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে, পরিবারে মায়ের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়। তুলনামূলকভাবে ছেলেরা মায়ের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে, বাইরের পৃথিবীটা এদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ছেলেরা বহির্মুখী হয়ে পড়ে আর যুক্তি ছাড়া কোনও কিছু মেনে নেয় না। মেয়েদের কাছে যুক্তির থেকে বড় হয়ে ওঠে দরদ আর মমতা, যা দিয়ে তারা বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে মানুষকে মূল্যায়ন করে। তাই সম্পর্ক ভেঙে গেলে একজন নারী ও একজন পুরুষ ভিন্ন প্রতিক্রিয়া করে। মেয়েরা দীর্ঘকাল বিষণ্ণতায় ভোগে এবং অনেকে আত্মহত্যার চেষ্টাও করে। প্রেমে বিফল হয়ে আত্মহত্যা করেছে এমন মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি। বেশ কিছু সার্ভে রিপোর্ট এমন কথাই বলে।

এমন বিপর্যয় থেকে বার হওয়ার উপায়? সম্পর্ক ভেঙে গেলেও প্রেমকে গুরুত্ব দিয়ে প্রেমের মর্যাদাকে রক্ষা করা উচিত বলে আমার মনে হয়। বিচ্ছেদের পরও অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেম নিঃশেষ হয়ে যায় না। অনেক সময় বিরহের যাপিত প্রহরগুলি মানুষের উত্তরণ ঘটায়। প্রত্যেকটি ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক মানুষকে শিখিয়ে দিয়ে যায় আরও বেশি যত্নশীল, ধৈর্যশীল ও সহনশীল হয়ে উঠতে। তাই যারা প্রেমকে নিঃশেষ হতে দেয় না, তারা প্রেমের রক্তিম আভাকে ধরে রাখে। এরাই প্রকৃতপক্ষে প্রেমিক, বিচ্ছেদের পরও যাদের জীবনে উত্তরণ ঘটে। মানুষ ভালবাসতে শিখেছিল একদিন তার নিজের আনন্দ অনুভূতির অংশ অন্য একজনকে দান করবে বলে ও নিজেও পরিশুদ্ধ হবে বলে। বিরহের দিনগুলোতেও প্রেম হ্রদের মতো স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দেয়। তাই সম্পর্ক ভাঙা মানেই প্রেম হারিয়ে যাওয়া নয়। প্রেমকে শেষ হতে না দিয়ে ধরে রাখার মধ্যেও চলে অন্য এক পরীক্ষা।

ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত

• Buxa Tiger Reserve • Chilapata Reserve • Coochbehar Palace • Gateway to Bhutan

The Heritage Duars Welcomes You

How do you reach

Nearest Railway Station : Dalgaon-Birpara and Hasimara on Kanchankanya Express Route. Falakata and New Coochbehar on general NJP-Assam route (Uttarbanga/Teesta-Torsha/Garib Rath/Kanchanjungha/Saraighat Express).

By Road : Accessible from Siliguri/Bagdogra/NJP and Coochbehar/Alipurduar

Best of Accommodations

Madarihat Tourist Lodge

A WBTDC owned resort with AC rooms and cottages, restaurant and bar, playing ground for the kids.

Acacia Resort

An eco resort in the midst of sprawling tea gardens and wilderness of Khayerbari with marvelous stay and dining.

Jaldapara Tourist Nest

A cosy nature resort in a homely atmosphere, facilities of food-stay and indoor games-library, on the way to Totopara.

Contact 9830410808, 033 6536 0463

অরণ্য মিত্র

চিন দেশের যৌনপুতুলের সঙ্গে পশ্চিমের পুতুলের তুলনা করলে যে প্রথমটাই অনেক লাভজনক, সেটা নবীন রাই বুঝতে পারছিলেন। পুতুলের জন্য খদ্দেরের অভাব হবে না। আত্মগোপন করে থাকা নবীন রাই তাই সে নিয়ে ভাবতে ভাবতে কাউকে আসতে দেখলেন। মুম্বইয়ের এক রাজকীয় ফ্ল্যাটে তখন বসেছে দিল্লি হাই-এর ক্যাবিনেট পর্যায়ের মিটিং। সেখানে কী বলতে চাইলেন সভাপতি গুর্মুখ রায়? বুদ্ধ ব্যানার্জির এলাকায় কি ডার্ক ক্যালকাটা সফল হবে? পল অধিকারীর সঙ্গে আলোচনা সেরে সুরেশ কুমার এসেছেন নাগরাকাটায়। তিনিও এগচ্ছেন পায়ে পায়ে। কীভাবে? টানটান উত্তেজনার আরও এক ধাপ এবারের পর্বে।

৫৮

মুনমুন টোপ্পোকে দেখার পর থেকে নবীন রাই চেষ্টায় ছিলেন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। পাঁপড় কারখানার মালিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিজু প্রসাদ এই মেয়েটাকেই ছাড়িয়ে এনেছিল ডুয়ার্স থেকে মেয়ে তোলার জন্য। মুনমুনের সঙ্গে একবারই দেখা হয়েছিল কয়েক মিনিটের জন্য। কথা হয়নি। সে আর বিজু প্রসাদ মেটেলি এসেছিল কোনও একটা কারণে। নবীন রাইয়ের সঙ্গে সেখানেই দেখা। চায়না থেকে সেক্স ডল আমদানি নিয়ে কথা বলার জন্য মেটেলি গিয়েছিলেন নবীন রাই। বিজু প্রসাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় মিনিট দশেক কথা হয়েছিল টুকটাক। মুনমুন দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে। তখনই বিষয়টা বিজু প্রসাদের মুখ থেকে জেনেছিলেন নবীন। কিন্তু মুনমুনের চেহারাটা মাথায় গেঁথে গিয়েছিল তাঁর। মেয়েদের তুলে আনার মতো কৌশলী মেয়ে চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ধরনের মেয়েদের খোঁজ পেলে নবীন রাই ভোলেন না।

কিন্তু বিজু প্রসাদ মরে যাওয়ায় ওর অধীনে কাজ করা লোকগুলো এখন বিভ্রান্ত। তারা সবাই পরবর্তী বিজু প্রসাদের অপেক্ষায় আছে। রঞ্জিত সম্ভবত দাসবাবুর তৈরি করা দলটাকেই কাজে লাগাবে। পরবর্তী বিজু প্রসাদ ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব তারই। অবশ্য মুনমুনকে কাজে লাগাবার ইচ্ছে থাকলে নবীন রাইয়ের কোনও সমস্যা হবে না এইসব কারণে।

ইচ্ছে থাকলেও অবশ্য উপায়ের আশু কোনও সম্ভাবনাই নেই। নবীন সেটা বিলক্ষণ জানেন। এখন লুকিয়ে থাকার সময়। তাঁর কাছে খবর আছে যে, তাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া গুলিটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ ক্যালিবারের বুলেট ছিল। এইরকম ভারী রাইফেলে সাইলেন্সার লাগিয়ে যারা হামলা করতে পারে, তাদের উপেক্ষা করাটা চূড়ান্ত বোকামি। রঞ্জিতের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিয়ে নবীন রাই তাই লুকিয়ে আছেন। খুব কাছের লোক ছাড়া কেউ তাঁর ডেরা জানে না।

মুনমুন টোপ্পোর কথা মাথা থেকে সরিয়ে নবীন রাই চিন থেকে আসা সেক্স ডল নিয়ে ভাবতে শুরু করে। লুকিয়ে থাকা দশাতেই সে বিষয়ে আবার খবর এসেছে তাঁর কাছে। আধ ডজন সেক্স ডল এ দেশে এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে আসবে। দাম দেড় লাখ করে। একদম ইউরোপ-আমেরিকার কোয়ালিটি। পুতুলের চোখের পলক ফেলা, শীৎকারের আওয়াজ, ফ্লেক্সিবিলিটি, টেম্পারেচার— এসব এতটাই আসল যে কাস্টমার খুশি না হয়ে পারবে না। ইন বিল্ট সাউন্ড সিস্টেমও খুব ভাল। মনেই হবে না মেকানিক্যাল ভয়েস। এ ছাড়াও পুতুলকে নাড়াচাড়া করলে তার স্তনযুগল আসলের মতোই আন্দোলিত হবে। বিছানায় চিৎ হয়ে থাকা একখানা পুতুলের ফোটোও পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা। দেখলে জ্যান্ত মেয়ে বলে ভ্রম হতে বাধ্য। তবে চায়না কাটিং মুখের বদলে ইন্ডিয়া কাটিং মুখ হলে এ দেশের বাজারে আড়াই-তিনে বেচে দিতে কোনও সমস্যা হত না।

নবীন রাইয়ের হাতে পুতুলের কাস্টমারের অভাব নেই। মার্কিন মুলুকে একখানা ঠিকঠাক

সেক্স ডলের দাম সাড়ে ছয় থেকে সাত লাখ। আনাতেও অনেক খরচ। সেই অনুপাতে চায়না পুতুলের দাম অনেক কমই বলতে হবে। ফলে নবীন রাই এই ব্যবসায় উৎসাহ বোধ করছেন। গ্রাফিক পর্ন নভেল তৈরির অফারও পেয়েছেন তিনি। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁর এখনও স্পষ্ট ধারণা হয়নি। হিন্দি ভাষায় নভেল বানাতে হবে। পুরো প্রোডাকশন হবে এ দেশে। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নবীন রাই দুটো পর্ন নভেলের নেপালি অনুবাদ বাজারে আনার কথা ভেবেছেন।

নবীন রাই ল্যাপটপ খুলে বসলেন। যোগাযোগ ফেসবুকের মাধ্যমে হবে। চাইনিজ এজেন্ট ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রেখেছে কোনও এক মহিলার ছদ্মনামে। নবীন রাই সেই অনুরোধ গ্রহণ করে বন্ধুর দেয়ালে লিখলেন, 'ইউ আর লুকস লাইক আ ডল।'

পনেরো মিনিটের মাথায় মন্তব্য এল, 'গুড ডল। ইজ নট ওকে?'

'ওকে।' মন্তব্য করল নবীন। প্রত্যুত্তরে এল একটা স্মাইলি। আরও আধ ঘণ্টা পর সেই বন্ধু নিজের দেয়ালে লিখল, 'ফিলিং হ্যাপি সুন গোয়িং জয়গাঁ।'

অর্থাৎ জয়গাঁ নামক স্থানে নমুনা পুতুল আসবে।

নবীন রাই চিন্তিত মুখে কম্পিউটার বন্ধ করে মোবাইল সেটটা তুলে নিয়ে ফোন করলেন রতন বিশ্বকর্মাকে। সিরাজুলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। রঞ্জিত নিজের মতো করে ডার্ক ক্যালকাটার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করলেও নবীন রাই নিজের মতো এগিয়ে যাওয়াটা বন্ধ করতে রাজি নন। ডুয়ার্স খুব বড় কোনও অঞ্চল নয়। নিজের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ডুয়ার্সে ডার্ক ক্যালকাটার কোনও খোঁজ নবীন রাই নিজেই বার করে নিতে পারবেন বলে আত্মবিশ্বাসী।

রতন ফোন ধরল না। দ্বিতীয়বার ডায়াল করতে গিয়ে নবীন রাই একটু থমকালেন। খোলা জানলা দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ওপারে পাহাড় উঠে গিয়েছে দেয়ালের মতো। রাস্তা আর এই বাড়ির মাঝে খানিকটা খোলা জমি আর গাছপালা। চার ফুট উঁচু দেয়াল। নবীন রাইয়ের মনে হল, কেউ যেন গেট ঠেলে ফাঁকা জমিটায় দ্রুত ঢুকে গেল।

গেটে পাহারা বলতে কিছু নেই। বাড়িটা আসলে একটা একতলা ছোট রেস্ট হাউজ। মাঝে মাঝে ছোট ম্যাপের আমলারা এসে থাকেন। পারমিশন বাগিয়ে পর্যটকও আসে কখনও। গ্রামটা ছোট আর শান্ত। নবীন রাই ভাল করে দেখার জন্য দরজার পরদাটা তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনবার জোরে পটকা ফাটার মতো আওয়াজ শুনলেন। এক লাফে পিছিয়ে এসে পিছনের দরজার দিকে ছুটলেন। প্রথম তিনটে গুলিই লেগেছে দরজায়। প্রাণপণে পিছনের বারান্দা টপকে নবীন রাই ঘাসজমিতে নামতে নামতে টের পেলেন আরও কয়েকটা গুলির শব্দ আর কাচ ভাঙার আওয়াজ। একটা মোটা গাছের পিছনে আড়াল নিয়ে তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

কিন্তু পিছনের বারান্দায় কেউ এল না।

৫৯

আঠারোতলার পেল্লায় জানালাটা দিয়ে আরব সাগরের পশ্চিম দিগন্তে ঝুলে থাকা সূর্যটাকে অসামান্য লাগছিল। জানলার সামনে একটা ডিম্বাকৃতি টেবিল। সেটা ঘিরে পাঁচজন ভারতীয় বসে রয়েছেন। চেয়ার একটা ফাঁকা থাকায় বোঝা যাচ্ছিল আরও একজন থাকা উচিত। কিন্তু তিনি এই মিটিং-এ থাকবেন না জানিয়েছেন। তাঁর নাম বুদ্ধ ব্যানার্জি। এটা আসলে দিল্লি হাই-এর অফিস। দিল্লি থেকে কাজকর্ম এগজিকিউট করা হলেও মুম্বইতেই তাঁদের গোপন দপ্তর। উপস্থিত পাঁচজনই অন্ধকার জগতের এক-একজন মুখ্যমন্ত্রীবিশেষ। দেশের এক-একটি অঞ্চলে এক-একজনের রাজত্ব।

আঠারোতলার এই ফ্ল্যাটটা কুমারজিতের নামে। তাঁর বয়স ষাট পেরিয়েছে। দিল্লি হাই-এর সর্বোচ্চ বৈঠকের দরকার হলে তিনি পার্টি দেন। বাকি পাঁচজন এসে আলোচনা সেরে ভরপুর পানাহারে ডুবে যান। এই ছ'জন নিজেদের মধ্যে একজনকে সভাপতি হিসেবে বেছে নেন এক বছরের জন্য। এ বছর দিল্লি হাই-এর সভাপতি হলেন গুর্মুখ রায়। ছোটখাটো চেহারার গুর্মুখ রায় চুরুট টেনে সুগন্ধি ধোঁয়া ওড়াচ্ছিলেন। আসলে কুমারজিৎ পাশের ঘরে খাদ্য-পানীয় টেবিলে সরিয়ে রেখে মিটিং-এ বসবেন। এই ফ্ল্যাটের ভিতরে কোনও সপ্তমজন কখনও আসেনি।

আজকের বৈঠক একটু জরুরি ভিত্তিতে ডাকা হয়েছে। কুমারজিৎ সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে নেশার দ্রব্য কিনে ইউরোপে বিক্রি করেন। নিজের কার্গো জাহাজেই সেসব জিনিস যায়। গুর্মুখ রায় তাঁকে গত সপ্তাহে ডুয়ার্সের পরিস্থিতি জানিয়ে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কুমারজিতের যাওয়ার কথা ছিল ভিয়েনা। বাকিদের মধ্যে আরও দু'জনেরও পরিকল্পনা ছিল দেশের বাইরে থাকার। কিন্তু গুর্মুখের প্রস্তাবের গুরুত্ব অনুমান করে সবাই নিজের কাজ বাতিল করে দিয়েছেন।

খাদ্য-পানীয়র ব্যবস্থা সেরে এসে কুমারজিৎ মিটিং-এ বসলেন। কথাবার্তা ইংরেজিতেই শুরু হল। কুমারজিৎ বললেন, 'আমরা এটা সবাই জানি যে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের একেবারে উত্তরে ডুয়ার্স এলাকায় আমাদের উপর আঘাত এসেছে। ওটা এবং গোটা নর্থ-ইস্ট ব্যানার্জিই দেখে।'

'ওখানে তো আমরা মেয়ে পাচারের কাজটাই করি।' বললেন ভি রাজন। দেশের সেরা চোরাই অলংকারের কারবারি।

'ইদানীং পর্ন সেক্টরে কাজ শুরু করেছিলাম।' কুমারজিৎ বললেন, 'এর বাইরে সেখানে লাল চন্দন আর বন্য প্রাণী পাচারের কাজ আছে। সেটা অন্য গ্রুপগুলো চালায়।'

'আমাদের উপর আক্রমণটা ঠিক কী ধরনের হয়েছে?' বুলন্দ অরোরা মিহি গলায় জানতে চাইলেন। উনি মোট তেষট্টিটা চিট ফান্ড খুলেছেন এযাবৎ।

'আক্রমণটা বলতে, দু'জনকে খুন করেছে। গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে আমরাও নিজেদের একজনকে সরিয়ে দিয়েছি। নবীন রাই নামের একজন পর্ন প্রোডিউসারকে দু'-দু'বার মারার চেষ্টা করেছে। একবার পয়েন্ট ফোর ফাইভ রাইফেল থেকে। সাইলেন্সার ছিল। পরের বার এ কে ফর্টি সেভেন দিয়ে। তবে আমার ধারণা, ওরা সেই নবীন রাইকে মারতে চায়নি। আমাদের কাছে বার্তা দিতে চেয়েছিল। পয়েন্ট ফোর ফাইভ রাইফেল যে-সে ব্যাপার নয়।'

'ওরা মানে ডার্ক ক্যালকাটা।' দেশের সেরা চরস ডিলার শিব দেশাই এবার কথা বললেন, 'কারা চালায় এই ডার্ক ক্যালকাটা?'

'কিছু ইনফর্মেশন পেয়েছি, কিন্তু মাথা সম্পর্কে এখনও কিছু জানতে পারিনি।' গুর্মুখ রায় চুরুটের শেষটা ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'তবে আমাদের দিল্লির জেড ক্যাটেগরি অ্যাকশন কমিটি কাজে নেমে গিয়েছে। ওদের হেড ক্যাভেন্ডিস ওয়েস্ট বেঙ্গলে যাওয়া-আসা করছে। আমি ঠিক করেছি, ডুয়ার্সে কয়েকটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আড়ালে চলে যাব।'

'ভাল সিদ্ধান্ত।' বুলন্দ অরোরা মিহি গলায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, 'রোমাঞ্চকর কিছু চাই। হেলিকপ্টার থেকে কিছু আর্মস ফেলে দিই ডুয়ার্সে? চায়না ছাপ মারা আর্মস। খেলা জমে যাবে।'

'সেটা নেক্সট টাইম করা যেতে পারে।' গুর্মুখ রায় জানালেন, 'কিন্তু বিস্ফোরণ দিয়ে স্থায়ী কোনও সমাধান হবে না। ডার্ক ক্যালকাটার উদ্দেশ্যটা খুব অস্পষ্ট আমাদের কাছে। এরা প্রায় গায়ে পড়ে আমাদের সঙ্গে সংঘাতে আসতে চাইছে। আন্ডারগ্রাউন্ড পলিটিক্সে এটা খুব অবাক করার মতো ব্যাপার।'

'আমি কিন্তু অবাক হচ্ছি না।' ভি রাজনের গলা শোনা গেল, 'ডার্ক ক্যালকাটা চাইছে ডুয়ার্স নিজেদের হাতে রাখতে। ওটা হাতে রাখতে পারলে এদিকে তিনটে কান্ট্রি আর ওদিকে গোটা নর্থ-ইস্ট ডিল করা সহজ হয়ে যাবে। আমার মনে হচ্ছে, ডার্ক ক্যালকাটার পিছনে বিদেশি মদত আছে। সম্ভবত চায়নার।'

'সভাপতি হিসেবে এ বছরটা আমি

সুরেশ কুমার স্টেশনের বাইরে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে নজর রাখছিলেন চারদিক। তিনি খুঁজছেন একজন ঝালমুড়ি বিক্রেতাকে, যার মুড়ি রাখার টিনের রং সবুজ এবং সামনের দিকে শিবের ছবি লাগানো। পল অধিকারীর সূত্র অনুযায়ী তাকে প্রতিদিন নাগরাকাটা স্টেশনের আশপাশে ট্রেন থামলে পাওয়া যায়। তার নাম রতনলাল।

সংগঠনের কাছে সর্বোচ্চ সময় দিচ্ছি। এটাই নিয়ম। কিন্তু ডুয়ার্সের বাইরে বাকি দেশে আমি ডার্ক ক্যালকাটার কোনও কাজকর্মের খবর পাইনি। মনে হচ্ছে, টিমটা ডুয়ার্স টার্গেট করেই নেমেছে।' গুর্মুখ রায় বললেন, 'কিন্তু সেখানে বুদ্ধ ব্যানার্জি আছেন। তিনি ঠিক সামলে নেবেন। আমাদের দায়িত্ব হল ডার্ক ক্যালকাটার নিউক্লিয়াসটা খুঁজে বার করা।'

কয়েক সেকেন্ড সবাই চুপ করে থাকলেন। তারপর সিদ্ধান্ত হল যে, উক্ত নিউক্লিয়াসটা খুঁজে বার করার জন্য দিল্লি হাই-এর তহবিল থেকে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। দরকারে সেটা বাড়বে।

তারপর পানভোজন শুরু হয়ে গেল।

বঙ্গোপসাগর থেকে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের কারণে ডুয়ার্স জুড়ে মেঘলা। তিরতির করে বৃষ্টি হচ্ছিল একটু আগেও। এখন সেটা থামলেও হাওয়া দিচ্ছে বেশ জোরে। সুরেশ কুমার নাগরাকাটা স্টেশনে ডিএমইউ থেকে নেমেছেন মিনিটকয়েক হল। আবহাওয়ার কারণে রাস্তাঘাটে লোক বলতে বিশেষ নেই। সুরেশ কুমার স্টেশনের বাইরে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে নজর রাখছিলেন চারদিক। তিনি খুঁজছেন একজন ঝালমুড়ি বিক্রেতাকে, যার মুড়ি রাখার টিনের রং সবুজ এবং সামনের দিকে শিবের ছবি লাগানো। পল অধিকারীর সূত্র অনুযায়ী তাকে প্রতিদিন নাগরাকাটা স্টেশনের আশপাশে ট্রেন থামলে পাওয়া যায়। তার নাম রতনলাল। সুরেশ কুমার এখন রতনলালকে খুঁজছেন।

পল অধিকারীর সঙ্গে মিটিংটা সফল হয়েছে বলা যায়। তাঁর দরকার টাকা এবং কিছু অস্ত্র আর বিস্ফোরক। সুরেশ কুমার তিনটেই সরবরাহ করবেন। বিনিময়ে পল অধিকারীর লোক দিল্লি হাই-এর লোকেদের উপর গুপ্ত আক্রমণ আর আঘাত চালিয়ে যাবে। পল অধিকারী চাইছেন একই দিনে পরপর কয়েকটি রেল স্টেশনে বিস্ফোরণ ঘটাতে। শুরু হবে এনজেপি দিয়ে। তারপর ডুয়ার্সের কয়েকটা স্টেশন। এনজেপি'তে বিস্ফোরণ ঘটানো বেশ কঠিন ব্যাপার এখন। যদি সেটা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে কোনও ট্রেনে বোমা ফাটানোর বিকল্প পরিকল্পনাও হয়েছে। রাজধানীর মতো দামি ট্রেনে সেটা সম্ভব হবে না বুঝে পল অধিকারী কয়েকটা সোজা ট্রেন ভেবে রেখেছিলেন, যেখানে নিরাপত্তা খুবই ঢিলাঢালা।

চুক্তির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পল অধিকারীর হাতে অন্তত আধ কোটি টাকা পৌঁছে দেবেন সুরেশ কুমার। মুড়িবিক্রেতা রতনলালকে সে কারণেই দরকার।

রতনলালকে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল। একজন সাধারণ চেহারার রাজবংশী যুবক। মাথার চুল সামান্য পাতলা। পেটের সামনে ঝুলে থাকা মুড়ির টিনটির দিকে তাকালেই শিব ঠাকুরের ছবিটি চোখে পড়ে যায়। সুরেশ কুমার তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

'মুড়ি কিনবেন?' রতনলাল এগিয়ে এসে জানতে চাইল, 'পাঁচ টাকা আর দশ টাকা।'

'মুই এলায় চিংড়িয়া যাম।' সুরেশ কুমার মৃদু স্বরে উচ্চারণ করলেন। বাক্যটা শুনেই রতনলালের হাসিখুশি ভাবটা পলকের জন্য উধাও হয়ে একটা বিস্ময় ফুটে উঠল। পরক্ষণেই আবার মুখে হাসি এনে বলল, 'আমার নাম রতনলাল। আমি কাস্টমারকে নিজের নাম বলি না।'

সুরেশ কুমার এবার একশো ভাগ নিশ্চিত হলেন যে তিনি খাঁটি রতনলালকেই পেয়েছেন। পল অধিকারীর হয়ে যারা ডুয়ার্সে টাকা জোগাড়ের চেষ্টায় আছে, তাদের মধ্যে রতনলাল এক নম্বরে। তার সঙ্গে থাকা টিনে রাখা মুড়ির ভিতরে হাত ডুবিয়ে দিলে পয়েন্ট নাইন এমএম-এর স্পর্শ পাওয়া যাবে। কোমরে একটা থলির মধ্যে আছে আটটা বুলেট। বন্দুক আর বুলেটে চালান দিয়ে হাজার বিশেক টাকা পাওয়ার আশায় সে আজ হাসিমারা যাওয়ার কথা ভাবছিল। পল অধিকারীর বার্তা পাওয়ার জন্য সে প্যাসেঞ্জার ট্রেন থামার সময়ে স্টেশনের চারপাশে একবার মুড়ির টিন নিয়ে ঘোরাঘুরি করে।

'এক সুটকেস মুড়ি আছে। দিয়ে আসতে হবে।' সুরেশ কুমার বললেন।

'কতটা মুড়ি?' কৌটোয় মুড়ির মধ্যে তেল ঢালতে ঢালতে জানতে চাইল রতনলাল।

'পঞ্চাশ লাখ। একশো টাকার নোটে। বড় সুটকেস হবে।'

রতনলাল বেশ যত্ন করেই মুড়ি বানায়। ঠোঙাটা সে সুরেশ কুমারের হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'দেখে খান। কিছু থাকতে পারে। দশ টাকা।'

সুরেশ কুমার একটা দশ টাকার নোট বার করে দিতেই রতনলাল সেটা পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটা দিল। সুরেশ কুমার মুড়ির ঠোঙাটার ভিতরটা দেখলেন। মুড়ির উপরে এক চিলতে কাগজ পড়ে আছে। তিনি ঠোঙা হাতে কিছুটা হেঁটে একটু ফাঁকা জায়গায় এসে কাগজের টুকরোটা বার করলেন। ডট পেনে এক লাইন লেখা— 'উলটো দিকে মোবাইল নাম্বার লিখে রাখুন।' সুরেশ কুমার এদিক-ওদিকে তাকালেন। সামনেই একটা মিষ্টির দোকান। চেয়ার-টেবিল আছে। তিনি দোকানে ঢুকে দুটো রসগোল্লায় অর্ডার দিয়ে পকেট থেকে কলম বার করে কাগজের টুকরোটার পিছনে ফোন নাম্বার লিখলেন। রতনলালকে আবার দেখা যাচ্ছে দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে 'মুড়ি, মশলা মুড়ি' বলে হাঁক দিতে। মিনিটকয়েক হাঁকাহাঁকির পর তাকে দেখা গেল দোকানে ঢুকে সুরেশ কুমারের পাশে বসে চা আর শিঙাড়ার অর্ডার দিতে।

'বৃষ্টিতে ব্যবসা শেষ করে দিল বুঝলেন?' সুরেশ কুমারের দিকে তাকিয়ে বলল সে। পকেট থেকে বিড়ি বার করল। 'খান একটা।' একটা বিড়ি সে এগিয়ে দিল সুরেশ কুমারের দিকে, 'এই ন্যান দেশলাই।'

সুরেশ কুমার দেশলাইটা নিয়ে বিড়ি ধরিয়ে ফেরত দিলেন। সঙ্গে কাগজের টুকরোটা। দুটো জিনিস একসঙ্গে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে পকেটে ঢুকিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রতনলাল বলল, 'আজ আর হাসিমারা যাব না। ব্যবসা হবে না। বিকেলে চালসা যাব।'

তারপর সুরেশ কুমারের চোখে চোখ রেখে হাসিমুখে বলল, 'চালসা মোড়ে বিকেল করে বসব কয়েকদিন বুঝলেন? আপনি যাবেন কোথায়?'

'মালবাজার।' বিড়ির ধোঁয়া উড়িয়ে জবাব দিলেন সুরেশ কুমার।

এর পর আর দু'জনের কথা হয়নি। দু'দিন পর মেটেলির কাছে একটা ফাঁকা জায়গায় দুপুর দুটো নাগাদ একটা পুরনো মোটরবাইক নিয়ে এসে থামল রতনলাল। সামনেই একটা ছোট কালভার্ট। সেখানে অটো দাঁড়িয়ে ছিল একটা। রতনলাল বাইক থেকে নেমে অটোটার কাছে এল। অটোতে কেবল চালক আর দুটো বড় বড় ব্যাগ। রতনলাল অটোর সামনে দাঁড়াতেই চালক বেরিয়ে এসে বাইকের দিকে হাঁটা দিল। আধ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল, চালক বদলাবদলি করে অটো আর মোটরবাইক একটু ব্যবধান রেখে চালসার দিকে ফিরে যাচ্ছে।

বলাই বাহুল্য যে এবার বাইক চালাচ্ছিলেন সুরেশ কুমার।

(ক্রমশ)

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-8/1 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

HOLIDAYAAR

SILIGURI • COOCHBEHAR • JALPAIGURI

Package Tour from NJP to NJP 2017-18

FIXED DEPARTURE IN GROUPS

	Shimla, Kulu, Manali (12 Days) Shimla, Manali, Rotangpass, Kullu, Kuffri, Chandigarh **Date of Journey:** 28/05/17	Rs. 16,500 (Per head) Rs. 14,500 (3rd person) Rs. 10,000 (5-11Yrs Child) Rs. 7,000 (2-5Yrs Child with Bus Seat)
	Mumbai-Goa (16 Days) Mumbai, Goa, Mahabaleswar, Aurangabad, Ajanta, Ellora **Date of Journey:** 29/09/17	Rs. 22,000 (Per head) Rs. 19,500 (3rd person) Rs. 15,500 (5-11Yrs Child) Rs. 7,000 (2-5Yrs Child with Bus Seat)
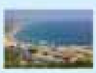	**Kerala with Kanyakumari (15 Days)** Kochin, Munnar, Thekkedy, Allepy, Trivandrum, Kanayakumari **Date of Journey:** 06/10/17	Rs. 20,600 (Per head) Rs. 18,500 (3rd person) Rs. 15,000 (5-11Yrs Child) Rs. 7,000 (2-5Yrs Child with Bus Seat)
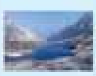	**Arunachal (12 Days)** Guwahati, Dirang, Bhalukpong, Tawang, Selapass, Bomdila **Date of Journey:** 16/04/17	Rs. 22,600 (Per head) Rs. 20,500 (3rd person) Rs. 16,000 (5-11Yrs Child) Rs. 8,000 (2-5Yrs Child with Bus Seat)
	Rajasthan with AC Bus (16 Days) Jaipur, Ajmer, Puskar, Chittorgarh, Udaipur, Mount Abu, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner **Date of Journey:** 04/01/18	Rs. 21,500 (Per head) Rs. 19,000 (3rd person) Rs. 15,000 (5-11Yrs Child) Rs. 7,000 (2-5Yrs Child with Bus Seat)
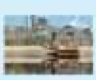	**Dooars (4 Days)** Garumara, Murti, Jhalong, Bindu, Jaldapara, Chilapata **Date of Journey:** 21/01/17, 20/05/2017, 20/12/2017	Rs. 8,200 (Per head) Rs. 7,100 (3rd person) Rs. 4,400 (5-11Yrs Child) Rs. 2,000 (2-5Yrs Child with Bus Seat)

LTC/LFC

Tailor made Packages. Any Time.

ANDAMANS

Ex Port Blair. 6N 7D

Portblair Sightseeing, Cellular Jail, North Bay-Ross Island/Jolly Buoy, Havelock/Neil island, Jarwa Reserve. Rs 16,500 Standard. CP, Non AC Vehicle & Govt Boat. Additional charges for Mayabandar-Diglipur.

GOA

Ex Dabolim Airport / Madgaon Rly. Stn. 3N 4D. Rs. 13,900 Standard. Plan CP, Pick up & drop Station/Airport, tea coffee maker, one full day sightseeing trip with river Mandovi cruise, Unlimited Swimming Pool. (Except Dec. 15 to Jan. 5)

KERALA

Ex Cochin. 7N 8D

Cochin-Munnar-Thekkady-Alleppey/Kumarakom-Kovalam
Rs 26,000 for Deluxe.
Plan CP; AC vehicle for transfer & sightseeing.

LAKSHADWEEP

Ex Cochin. 5N 6D. Cochin 1N - Kavaratti, Kalpeni, Minicoy 4N on Cruise Rs 29,500. Plan CP. Pick up and drop from Cochin Airport / Rly. Stn.

BANGKOK PATTAYA

5N 6D. Pattaya 3 Nights & Bangkok 2 nights.
Rs 35,000 onward (Except December & January).

SIKKIM-NORTH BENGAL

Ex Bagdogra / NJP. 4N 5D
Darjeeling/Kalimpong, Gangtok/ Pelling. Rs 8,900 onward. Plan CP; NonAC vehicle for transfer & sightseeing.

All rates are per head and on twin/triple sharing basis, minimum 4 adults required.

Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928
Cooch-Behar Office: Sitalabari Road, Ward No. 5, Dinhata 736135, Ph: +91 9434042969
Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.